প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৬৫

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থের নামকরণেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে কী তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা উভয় কবির রচনা পাশাপাশি তুলিয়া শুধু যে ভাবগত সামঞ্জস্য প্রদর্শন কবিয়াছি তাহা নয়, আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের গঠনেই কালিদাসের সহিত স্বাভাবিক ঐক্য ছিল, এই কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিবর্গের মধ্যে তিনি কালিদাসের দ্বারাই সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই প্রভাব কোন্ পথে কী ভাবে আসিয়াছে, কোন্ স্থলে প্রভাব প্রত্যক্ষ কোন্ স্থলে পরোক্ষ, এবং প্রভাব বলিতেই বা কী বুঝিব, আমরা এ সকল প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কালিদাসীয় ভাব ও অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথে কী ভাবে অনুরূপ ভাব ও অলঙ্কারের এবং বিপরীত-রীতিতে যথাক্রমে অলঙ্কার ও ভাবের উপস্থাপনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যাহাকে ইংরেজ কবি শেলির উপমাগত বৈচিত্র্যের অনুকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা যে প্রকৃতপক্ষে কালিদাসীয় উপমার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে সে বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন করা হইয়াছে এবং কালিদাসীয় উপমার বিবিধ বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে সে প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে বিচার করা হইয়াছে।

গীতাঞ্জলিতে কুমারসম্ভবের ভাবপ্রেরণা কী ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 'প্রেমবৈচিত্ত্য' ভাবটি যে বৈষ্ণব কবিদের মৌলিক কল্পনা, সাধারণ্যে পরিচিত এই তথ্যটির আমরা নিঃসন্দেহে খণ্ডন করিয়াছি এবং রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র সংজ্ঞা এবং কালি-দাসীয় শ্লোকের ভাব এবং কোন স্থলে ভাষা ও যে এক তাহা প্রদর্শন করিয়া রবীন্দ্রনাথে উক্ত ভাবটি কী ভাবে বিবর্তন লাভ করিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।

উভয় কবির মানসসাদৃশ্য আমরা দেখিয়াছি শব্দ-প্রয়োগে, চিত্র-কল্পনায়, জীবনের আদর্শের অনুচিন্তনে, ভাববিলাসে, অলংকরণ-পরিপাট্যে (decorative art), প্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়ী ভাবের রোম্যান্টিক বিষাদে ও অতীতমুখিতায়; বৈসাদৃশ্য দেখিয়াছি কাব্যের গঠনে—যে-বৈসাদৃশ্য উভয়ের কাব্যে স্বাভাবিক, কারণ একজনের রীতি স্থপতিসুলভ—দৃঢ় সুষম ঘনপিনদ্ধ ; অপরের গীতিকাব্য সুলভ,—কখনো ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মতো ফেনোচ্ছল, ঊর্মিমুখর, কখনো সুদূর অলক্ষ্য নভশ্চর বিহঙ্গের মতো সুরের মুক্তপক্ষে উধাও। এই বৈসাদৃশ্য অনেকটা দুই বিভিন্ন যুগের কাব্যধর্মের দান বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

শৃঙ্গারের উপস্থাপনাদ্বারা প্রকৃতির অনুরঞ্জন ও কাব্যের উপজীব্য ভাবের প্রসাধন যে উভয় কবির কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং সমানধর্মা কবি-কল্পনারই প্রকৃতি তাহাও আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উভয় কবির রচনায় সাংকেতিকতার প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনাও গ্রন্থে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কালিদাসীয় কাব্যের কাহিনী-গত উপকরণ রবীন্দ্রকাব্যে কোথাও অনায়াস-সুলভ ভাবে, কোথাও বা সযত্ন প্রয়াসের ফলে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাও উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সর্বোপরি আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিযাছি যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা কোথাও এই প্রভাবের ফলে আচ্ছন্ন হয় নাই। কবি যাহা পাইয়াছেন তাহা স্বীয় প্রতিভার বলে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া পাঠকের হাতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাই কখনো এই প্রভাব প্রাচীন দিগন্তের প্রতি পাঠকের চিত্তকে উৎকণ্ঠ করিয়াছে, কখনো আধুনিক কাব্যের রূপসজ্জায় প্রাচীন দিনের অলঙ্করণের ফলে নূতনতর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সব মিলিয়া কখনো প্রকাশ্য, কখনো অর্ধ-প্রচ্ছন্নভাবে সে-কালের পৃথিবীর 'কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্' সমস্ত রচনাকে দীপ্তিময় করিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্য পড়িতে ও পড়াইতে গিয়া বহুস্থলে কালিদাসীয় কাব্যের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ উভয় কবির কাব্য সম্পর্কে গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিতে

ঔৎসুক্য জন্মে। তাই স্বচিন্তিত তথ্য ও অপরাপর যে সকল পণ্ডিত রবীন্দ্র-নাথ ও কালিদাস সম্পর্কে যাহা কিছু প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের মানসে সংক্ষেপে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

যে সকল সিদ্ধান্তে এক সময়ে উপনীত হওয়া গিয়াছে, হয়তো কিছু সময় পরে অথবা দীর্ঘকালের ব্যবধানে সে সকল নূতনতর চিন্তার ফলে বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি সম্পর্কে লেখকের ধারণা মোটামোটি রকম অবিচল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই সংহত ভাবে একটি নিবন্ধের আকারে সুধীজনের অনুমোদনের ভরসায় শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধির পরীক্ষকরূপে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থখানিকে অনুমোদিত করিয়া লেখককে সম্মানিত করিয়াছেন।

গ্রন্থরচনার বিবিধ পর্যায়ে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহ ও পরামর্শে উপকৃত হইয়াছি।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স্ গ্রন্থখানির প্রকাশনভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অলমতিবিস্তরেণ

১০।৯।৫৮

৩০বি, সব্‌জিবাগান লেন
কলিকাতা-২৭

বিমলকান্তি সমদ্দার

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, অতএব রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধাদির প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনায় স্থান পাইবে না। তবে নাটক, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্যধর্মী বলিয়া তাহার বিষয়ে কিছু আলোচনা এই প্রবন্ধে অঙ্গীকৃত হইবে। একথা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্র-কাব্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বা রসবিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

রবীন্দ্রকাব্য কালিদাসের কাব্য ও নাটক দ্বারা কী ভাবে ও কী পরিমাণে প্রভাবান্বিত সে আলোচনার পূর্বে উক্ত প্রভাব-নির্ণয়ের উপযোগিতা কী, প্রভাব কাহাকে বলিব, প্রভাব কত প্রকারের হইতে পারে ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

প্রভাব-নির্ণয়ের উপযোগিতা

রবীন্দ্রনাথের তথা যে কোন বিখ্যাত আধুনিক সাহিত্যিকের উপর অপর কোন বিখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিকের প্রভাব আছে কি না অথবা উভয়ের রচনার প্রকৃতিতে বিশেষ কোন সাদৃশ্য আছে কি না এ বিচারের বহুমুখী প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ আধুনিক সাহিত্যের বিচারে লেখক-মানস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অপরিহার্য, কারণ আজিকার সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় বিশেষভাবে অহং-প্রধান। অতএব কাব্য-জিজ্ঞাসার সহিত কবি-মানস-জিজ্ঞাসার সম্পর্ক অতি নিবিড়।

দ্বিতীয়তঃ, রোম্যান্টিক সাহিত্যের যে অংশ অতীত-সংশ্রয়ের দ্বারা রস-নিবিড় তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি কখনো সম্ভবপর নয় যে পর্যন্ত বর্তমান যুগের রোম্যান্টিক কবি আপন ভাবালস কল্পনা দ্বারা প্রাচীন কবির কাব্যে বর্ণিত জগতের কোন্ কোন্ বিশেষ প্রান্ত স্পর্শ করিয়াছেন তাহা আবিষ্কার করা না যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'কল্পনা' কাব্যের 'স্বপ্ন' বা 'ক্ষণিকার' 'সে-কাল' কবিতার রসের স্বাদ কালিদাসের মূল কাব্য সম্পর্কে যাঁহার স্পষ্ট ধারণা নাই তিনি কখনও পাইবেন না।

তৃতীয়তঃ, রসিক পাঠক আধুনিক কবিতায় বিখ্যাত প্রাচীন কাব্যের কোন বিশেষ ভাবের বা বাগ্‌ভঙ্গীর কোন প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিলে অপ্রত্যাশিতভাবে উপরি-পাওনা নূতন এক প্রকার আনন্দে পুলকিত বোধ করেন। 'মানসসুন্দরী' কবিতার—

> ....মিলনে আছিলে বাঁধা
> শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
> আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
> তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

পংক্তিগুলি রসিক পাঠক মাত্রেরই প্রাণে সাড়া তুলিবে। কিন্তু পাঠকালে সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার মনে পড়িবে—

> সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
> সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

তিনি যে কিছু অধিকতর আনন্দ উপরি-পাওনা হিসাবে লাভ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। এই বিচিত্র পৃথিবীতে সমানধর্মা

সুহৃদ্‌লাভে যে আনন্দ, পাঠকের প্রিয় দুই কবির মধ্যে কালের দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের চিন্তা-সম্মিতির আবিষ্কারের আনন্দ তাহারই সগোত্র।

প্রভাব কাহাকে বলিব

চিন্তা-সঙ্গতি থাকিলেই প্রভাব-কল্পনার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে প্রভাব বলিয়া মনে হয় তাহা দুই মৌলিক, আত্মনির্ভর রচনার অন্তশ্চর সাদৃশ্য-ও হইতে পারে। 'প্রভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে পরবর্তী রচনার উপর পূর্ববর্তী রচনার প্রভুত্বের দ্যোতনা রহিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী রচনা পূর্বগামীর প্রাণরসে পুষ্ট পরগাছার মত হইতেই যে বাধ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা সত্য নয়। অবশ্য দুর্বল অক্ষম অনুকরণ সাহিত্যপদবাচ্য নয় বলিয়া তাহার আলোচনা-ও এস্থলে অবান্তর।

প্রভাব অবশ্যই প্রবল আকর্ষণের ফল। এই আকর্ষণ অনুরক্তি বা বিরাগ এই উভয়ের ফলেই সঞ্জাত হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য এই যে প্রভাবের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে পূর্ববর্তী কবি অর্বাচীন কবি অপেক্ষা সর্বথা অধিকতর শক্তিমান। এমন-ও হইতে পারে যে দুর্বলতর কোন প্রাচীন রচনার মধ্যে আপন ভাব-কল্পনার বা বাগ্‌ভঙ্গীর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া আপনার নির্দিষ্ট পথেই পরবর্তী কবি অধিকতর দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। সে স্থলে যে-প্রভাব পরবর্তী কবির কাব্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল তাহার গণিতিক পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কোন পরিমাপ-যন্ত্রে ধরা পড়িবার মত নয়। ইহাকে যদি প্রভাব বলিয়া একান্তই স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা, বলা বাহুল্য, একান্ত সূক্ষ্ম।

ইহা অপেক্ষা প্রবল অথচ মূলতঃ সূক্ষ্ম বলিয়াই সেই জাতীয় প্রভাবকেও গণনা করা যাইতে পারে যাহা পরবর্তী লেখকের মধ্যে আপনভাব ও পারিপার্শ্বিকতার পরিমণ্ডল এমনভাবে সঞ্চারিত করে যে তাহার নূতন আশ্রয় হইতে উহাকে আর স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে না; ঋণী লেখক তাহাকে আপনার প্রতিভা বলে আপনার করিয়া তোলেন। অর্বাচীন রচনাকে সেখানে অবশ্যই মৌলিকতার প্রাপ্য সম্মান সহৃদয় পাঠক স্বতঃই প্রদান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর প্রভাব সর্বদেশে ও সর্বকালে পরবর্তী সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সাহিত্য-প্রভাব অনুরাগ-জাত।

পূর্বগামী সাহিত্যের রুচি, আদর্শ, উপকরণ, পরিবেশ, রচনাভঙ্গী প্রভৃতির প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও তাহাদের অস্বীকার, সার্থক এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যর্থ উভয়বিধ সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিতে পারে। কালের পরিবর্তনের সহিত সহযোগিতা রক্ষা না করিয়া অভিনবত্বের মোহে নূতন কিছু করিবার প্রয়াস সকল দেশেই স্বল্পাধিক পরিমাণে ক্ষণজীবী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অপর পক্ষে কোন সাহিত্যিকের বা সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর অসুস্থ রুগ্ণ চিত্তের পরিচায়ক আপাত-রমণীয় রচনার প্রতি অপরাপর সাহিত্যিকের স্বাভাবিক বিরাগের ফলে সার্থক সাহিত্যের উদ্ভবের ইতিহাসও কোন দেশেই বিরল নয়। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক আকর্ষণের অভাবের ফলে উভয় সাহিত্যের বিপরীতমুখিতা সম্ভব হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহাকেও এক শ্রেণীর প্রভাব বলিয়া স্বীকার করা চলে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে সাহিত্যিক প্রভাবকে গণ্ডীবদ্ধ করিলেও প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সূক্ষ্ম সাধর্ম্য আছে। যাহা অনুরক্তি-সূচক তাহার মধ্যে

বিরাগের কোন মৃদু স্পর্শও থাকিবে না; অথবা যাহাকে অনুরাগ-মূলক প্রভাব বলা হইতেছে তাহার মূলে শুধু প্রবল সাধর্ম্যই যে প্রাচীন কবির সমর্থনের ফলে কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইতেছে না এমন কথা বলা চলে না।

এই কথা হইতেই সাহিত্যিক প্রভাব যে সচেতন এবং অবচেতন এই উভয় প্রকারেরই হইতে পারে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। সাধারণতঃ এই প্রকারের ধারণা অনেকের চিত্তে বদ্ধমূল যে প্রভাব-সচেতন সাহিত্যশিল্প অক্ষম অনুকরণেরই নামান্তর। কিন্তু এ ধারণা সর্বত্র সত্য নয়।

অনুরাগ-জনিত সচেতন প্রভাব আবার দুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে আমরা সেই সকল রচনার স্থান নির্দেশ করিতে পারি যে-গুলিতে ভাব বা প্রকাশভঙ্গী পূর্বতন কবির কাব্য হইতে অপহৃত হইয়া নূতন বেশে এমন ভাবে নবীন কবির কাব্যে অঙ্গীভূত হইয়াছে যাহাতে তাহার আদি ইতিহাস চাপা পড়িয়াছে। ইহা নিতান্তই কুম্ভীলক-বৃত্তি। সকল দেশের সাহিত্যেই এ জিনিসটি প্রাচীনকাল হইতে আছে।

সেই সকল রচনা দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত, যাহাতে কবির লক্ষ্য বিদগ্ধ পণ্ডিত পাঠকের জাগ্রৎ চেতনা। মূল রচনার সহিত পরিচয়ের ফলে নবীন কাব্যের মধ্যে কোন বিশেষ শব্দাবলীর ধ্বনি-বৈচিত্র্যে, পরিচিত কোন অলঙ্কারের নবতর বিন্যাসে, আভাসে-ইঙ্গিতে কিংবা প্রকাশের ঔজ্জ্বল্যে কোন পরিচিত ভাবের খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ উপ-স্থাপনার দৌত্যে, রসিক পাঠক প্রাচীন কাব্যের নূতন স্বাদ লাভ করিবেন,—নবীন কবি কখনও বা এমন আশাও অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন।

কবি যে পুরাতন কাব্যের নবায়ন সম্ভব করিয়াছেন এই কথাটি পাঠমাত্রেই উপলব্ধি করিয়া সাধারণ পাঠকের গ্রাহ্য আনন্দের অতিরিক্ত পূর্ব-কথিত এক প্রকার আনন্দে উভয় কবির কাব্যে যাঁহাদের সমান অধিকার তাঁহারা উল্লসিত হইয়া উঠেন। এ এক অভিনব রস-পরিবেষণ। প্রাণের একান্ত পরিচিত প্রিয়তমকে নব নব বেশে বৈষ্ণব কবিগণ যে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কখনও দানী বেশে, কখনো যোগি-বেশে, কখনো নাবিক বেশে—এ তেমনই এক প্রকার নবীন রসাস্বাদন-প্রয়াস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, "মহুয়া" কাব্যের "বিজয়ী" কবিতাটির—

"কানন-পর ছায়া বুলায়
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা"।

এই পংক্তি-নিচয়ে যে উৎপ্রেক্ষাটির প্রয়োগ তাহা যে মেঘদূত কাব্যের—

"তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপান-পংক্তিম্।
গৌরী-বক্ত্র-ভ্রুকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশ-গ্রহণমকরোদিন্দু লগ্নোর্মিহস্তা॥"

শ্লোকটি হইতে কবি সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ। তবে এই বিশেষ উৎসটি পাঠক দ্বারা আবিষ্কৃত হউক একথা কবির অন্তরে ছিল কিনা এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 'মানসী'র "মেঘদূত" কবিতায় কবি যখন লিখিতেছেন,—

"কোথা কনখল,
কোথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবন-চঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করি অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।"

তখন কালিদাসের মেঘদূতের সহিত যাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে স্বীয় কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদের জন্য এমন পাঠকের মুখাপেক্ষী হইয়া আছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১]

এই প্রসঙ্গে আর একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য

"বিভ্রাণমুত্তুঙ্গতরঙ্গমালাং
গঙ্গাং জটাজুটতটং ভজন্তীম্।
গৌরীং তদুৎসঙ্গজুষং হসন্তী-
মিব স্বফেনৈঃ শরদভ্রশুভ্রৈঃ॥"—কুমারসম্ভব ১২শ সর্গ, ১০

[(ইন্দ্র দেখিলেন) তাঁহার (মহেশ্বরের) উৎসঙ্গদেশে পার্বতী অবস্থিত রহিয়াছেন, জটাজুটে উত্তুঙ্গ তরঙ্গসঙ্কুলা গঙ্গাদেবী অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় শারদ মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ফেন সমূহ দ্বারা যেন গৌরীকে উপহাস করিতেছেন।]

অবশ্য কুমারসম্ভবের এই শ্লোক উক্ত কাব্যের যে অংশের অন্তর্ভুক্ত তাহাকে রবীন্দ্রনাথ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পণ্ডিতগণেরও অভিমত তাহাই। তুলনীয়—

"..................যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
থামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী-পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে!"

—চৈতালি, কুমারসম্ভব গান।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর কালিদাসীয় কাব্যের যে-প্রভাব বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় উহা পরবর্তী মহাকবির রসগ্রাহিতা-সঞ্জাত।

কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় সেই বয়সে যখন যাহা কিছু শক্তিমান ও রমণীয় তাহারই ছাপ মনের উপর সহজে পড়ে ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, মানব-চিত্ত যখন সর্বাধিক কোমল, কৌতূহলী ও কল্পনা-প্রবণ—সেই শৈশবে। কবি ১৮৭৩-৭৪ সালে ১২।১৩ বৎসর বয়সে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কুমার সম্ভবের কিয়দংশের কাব্যানুবাদ করেন। "সানাই" কাব্যের "অনসূয়া" কবিতাটি রচিত হয় ১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই দীর্ঘ সময়ে ও কালিদাসের কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ মন্দীভূত হয় নাই।

কবির সংস্কৃত জ্ঞান

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান কী রকম ছিল? তাঁহার জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মহর্ষির পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোক প্রত্যেক বালক-বালিকাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত করানো ছিল আবশ্যিক বিধান। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে মহর্ষির যেমন নিষ্ঠা ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও সে বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। তাঁহার নিজের সংস্কৃত

অবশ্য ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গৃহীত হইলেও উৎপ্রেক্ষাটি এখান হইতে গৃহীত হইবার বিপক্ষে কোন যুক্তি নাই, তবে আমাদের মনে হয় যে প্রথমোক্ত শ্লোক হইতেই কবি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

বুনিয়াদ খুব পাকা না থাকিলেও প্রতিভাবলে সংস্কৃত সাহিত্যের রস গ্রহণের ক্ষমতা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন।”

[রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড, ‘চৈতালি-দ্বিতীয়ার্ধ’ পরিচ্ছেদ।]

এই অনুশীলনের ফলে তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ্ এবং লৌকিক কবিগণের মধ্যে কালিদাসের কাব্য ও নাটক, বাণভট্টের কাদম্বরী, অমরুশতক এবং গীতগোবিন্দ যে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। যিনি মূল জার্মান ভাষায় গেটের ‘ফাউস্ট’ পড়িবার জন্য জার্মান ভাষা কিছু কিছু শিখিয়া উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[১] তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণে বুৎপত্তি লাভ সম্ভবপর না হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যের খাসমহলে প্রবেশ যে কঠিন হয় নাই শুধু ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে, মানুষের শৈশবে তাহার দেহ যখন নিতান্তই অপরিণত ও প্রকৃতির হাতে নির্মীয়মাণ তখন কোন কোন রোগ তাহার মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে, বয়স্ক মানুষের যে-ব্যাধিবীজ সংক্রেমণের ভয় নাই। আপন সাহিত্যরীতির সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে, একাত্ম হইয়া যদি কোন সাহিত্য-সংস্কার গড়িয়া ওঠে এবং তাহা অপর কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের প্রভাবের ফলে যদি সম্ভব হইয়া থাকে তবে তাহা জীবনের এই অধ্যায়েই খুঁজিতে হইবে। কবির কাব্য যখন পরিণতির ফলে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে,

১। ১৮৯০ সালের ৩রা জুন শিলাইদহ হইতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিয়াছে, সে সময়ে অপেক্ষা কৈশোরের রচনার মধ্যেই ঈপ্সিত-প্রকার কাব্য-প্রভাবের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। একথা যদিও অবশ্য-স্বীকার্য যে কবিচিত্তের সাধারণ ধর্মই বহির্বিশ্বের প্রতি অনলস কৌতূহলে নিরন্তর নিজেকে জাগরূক রাখা এবং সেই কারণে অপরের কাব্য-প্রভাব যে-কোন সময়ে সম্ভবপর, তথাপি যে পর্যন্ত কোন কবির আপন ভাষা ও রচনা-বৈশিষ্ট্য একটা নির্দিষ্ট রূপ পায় নাই, যে পর্যন্ত অপরের রচনার ভাব ও রচনারীতির আত্মীকরণ সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই, সেই সময়ের মধ্যেই স্থূলতর প্রভাবের সন্ধান করা উচিত। রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে 'কল্পনা'-কাব্যের রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই কথাটি এইভাবে প্রকাশ করা অধিকতর সঙ্গত যে, কৈশোরে রবীন্দ্র-মানসে কালিদাসের প্রভাব পড়িয়াছিল এবং সার্থক কাব্যে এ যাবৎ তাহা প্রকাশ পায় নাই। এতকাল যাহা শিশুকণ্ঠের অস্ফুট ভাষা আশ্রয় করিয়া প্রকাশের ব্যাকুলতা বহন করিয়াছিল 'কল্পনায়' তাহা সার্থক কাব্য-পরিণাম লাভ করিয়াছে মাত্র।

প্রভাব-সঞ্চারের পথ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে দুই প্রকারে উক্ত প্রভাব এক কবির কাব্য হইতে অপরের কাব্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কাব্য-পাঠের ফলে বা কবির সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উহা সঞ্চারিত হইতে পারে,

ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রভাব বলা যায়। আবার অপর কোন এমন লেখকের রচনা-পাঠ বা তাহার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে উহা সঞ্চারিত হইতে পারে যাঁহার উপর পূর্ববর্তী লেখকের প্রভাব মুদ্রিত আছে। এই শ্রেণীর প্রভাবকে পরোক্ষ প্রভাব বলা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাইব, এই উভয় প্রকারের প্রভাবই কালিদাসের কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে-প্রভাব প্রত্যক্ষ তাহার ফলই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের শুধু কাব্যের উপর কালিদাসের যে প্রভাব তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধে আমরা করিব।

কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ নানা বিচিত্রপথে সঞ্চারিত হইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সে সময়ে সাহিত্য-চর্চার উদার আসরে কালিদাস বহুমান্য ছিলেন। ১২৬৬ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন এবং অল্পকালমধ্যে গণেন্দ্র-নাথ বিক্রমোর্বশীয়ের অনুবাদ করেন।

সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালীকে কালিদাসের কাব্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে যিনি প্রথম আকৃষ্ট করিয়াছেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরাজি ১৮৬৬ সালে। এই গ্রন্থের বিবিধ অধ্যায়ের শীর্ষে অপরাপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতির সঙ্গে শকুন্তলা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভব হইতে উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছে। "দূরাদয়শ্চক্র" ইত্যাদি রঘু ১৩।১৫ শ্লোকটি নবকুমার আবৃত্তি করিয়াছেন। যে-বিহারীলাল তাঁহার শৈশবের কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন তিনি নিজে কালিদাসের মুগ্ধ ভক্ত। তাঁহার বিবিধ কাব্যের বিবিধ সর্গের

শিরোদেশে কালিদাস হইতে উদ্ধৃতি।[১] তাঁহার কাব্যের বহুস্থলে তিনি কালিদাসের কল্পনার কাছে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে কী ভাবে যে কালিদাসের কাব্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কালিদাসের কয়েকটি শ্লোক ও তাঁহার কিছু রচনা পাশাপাশি রাখিয়া দেখানো হইতেছে। বিহারী-লালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যের চতুর্থ সর্গের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে কালিদাসের আনুগত্য চমৎকৃতিপূর্ণ।

"তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম,
শ্বেতনীল পদ্মদল যেন একত্তরে,
অথবা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম।"

১। (ক) "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের তৃতায় সর্গের শীর্ষে "ন প্রভা-তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"

(খ) "অভাগিনী" নামক দশম সর্গে "কুদো মে দুরাহিরোহিনী আসা।"

(গ) 'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যের 'সমুদ্রদর্শন' নামক দ্বিতীয় সর্গে "বিক্ষোরি-বাস্থানবধারণীয়মীদৃক্তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা।"

(ঘ) "বন্ধুবিয়োগ" কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে "গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।"

(ঙ) উক্তকাব্যের তৃতীয় সর্গে

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।

(চ) উহারই চতুর্থ সর্গে "সমানা স্বর্যা তাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসখাঃ॥

রঘুবংশের গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের বর্ণনার

"অন্যত্রমালা সিতপঙ্কজানা-
মিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব—" (১৩শ সর্গ, ৫৪)

এবং মেঘদূত কাব্যের—

"তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বচ্ছেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসিচ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত-যমুনা-সঙ্গমেবাভিরামা ॥"

—উত্তরমেঘ, ৫

এই শ্লোকটির তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের ভাব যে এখানে সযত্ন প্রয়াসে অঙ্গীকৃত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১]

সারদামঙ্গল কাব্যের চতুর্থ সর্গে কুমারের চিত্র-কল্পনার অনুকরণ অতি স্পষ্ট।

১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের সহিত উপমা কালিদাসের প্রিয়।

তুলনীয়—

"যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং
প্রক্ষালনাদ্ বারি-বিহার কালে।
কলিন্দ-কন্যা মথুরাং গতাপি
গঙ্গোর্মি-সংসক্ত জলেব ভাতি।" —রঘু ৬।৪৮

[যমুনায় (সুষেণের) জলবিহারকালে পুরস্ত্রীদের স্তনচন্দনের সংযোগের ফলে মথুরায় প্রবহমাণা হইলেও কালিন্দী গঙ্গা-তরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।]

"এই গণ্ডশৈল-ঘিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময়।
তৃণতরুলতা জালে
অপরূপ লালে লাল
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়।"

এ শ্লোকে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ের ছায়াপাত ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যশ্চাপ্সরো বিভ্রম-মণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহকচ্ছেদ-বিভক্তরাগা-
মকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥

—কুমারসম্ভব ১ম সর্গ, ৪

[সেই হিমালয়ে বিবিধ ধাতব পদার্থের গৈরিক রঙের আভা মেঘের ফাঁকে গিয়া অকাল সন্ধ্যা ঘনাইয়া আনে ও অপ্সরারা মিলন কাল আসন্ন মনে করিয়া প্রসাধনে ভুল করিতে থাকে।]

সিংহ-কেশরসটাসু ভূভৃতাং
পল্লব-প্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু ভানুনা
সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্॥ —কুমার ৮।৪৬

[দেখ, পর্বতের ধাতুময় শিখরগুলিতে, উদ্‌গত-পল্লব তরুরাজিতে ও সিংহ-কেশরে সূর্য সন্ধ্যার লোহিত-রাগ ছড়াইয়া গিয়াছে।]

আবার—

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ মুখে উচ-কানে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিক্কণ শুভ্রকায়
মাছি পিছলিয়া যায়
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা[১]-লহরী।"

এই উদ্ধৃত স্তবকের পার্শ্বে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ধরিলে কুমার-সম্ভবের আনুগত্য সহজেই বিশদ হইবে ঃ—

লাঙ্গুল-বিক্ষেপ-বিসর্পি-শোভৈ-
রিতস্ততশ্চন্দ্র-মরীচিগৌরৈঃ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং
কুর্বন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্যঃ॥—ঐ, ১৩

[হিমাদ্রিকে গিরিরাজ বলা হয় ; পুচ্ছাগ্রজাত চন্দ্রিকা-শুভ্র কেশরাশি দুলাইয়া যে শোভার সঞ্চার করিয়া চমরীগণ বিচরণ করে তাহাতে তাহারা এই গিরিরাজ আখ্যা সার্থক করিয়া থাকে।]

'সাধের আসন' কাব্যের পঞ্চম সর্গে—

ওঁরা বুঝি সপ্ত ঋষি,
প্রভাবে উজলি দিশি
অমর নগর হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে ?
রোমাঞ্চ কিরণ-জালে যেন সপ্ত সূর্যোদয়।
স্নিগ্ধ-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিয়া চেয়ে রয়।

১। বিহারীলাল যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এমন মনে হয় না। 'চন্দ্রিমা' বলিয়া কোন শব্দ নাই, 'চন্দ্রিকা' আছে,—অর্থ জ্যোৎস্না।

তাম্র-শ্মশ্রু, তাম্রজটা
বিতরে বিজলী-ছটা
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করুণা!
কি তপ্ত কাঞ্চন দেহ;
সর্বাঙ্গে উদার স্নেহ!
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল করুণা!

কুমারসম্ভবের ৬ষ্ঠ সর্গে সপ্তর্ষিদের আকাশমার্গ হইতে অবতরণের বর্ণনা—

"তে সদ্মনি গিরের্বেগাদুন্মুখ-দ্বাঃস্থ-বীক্ষিতাঃ।
অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ॥ ৪৮
গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা।
তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনি-পরম্পরা॥" ৪৯

[আকাশ হইতে ঋষিরা হিমালয়-সদনে যখন সবেগে অবতরণ করিতে ছিলেন তখন চিত্রলিখিত বহ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গল জটাভারে শোভমান তাঁহাদিগকে নগরদ্বার রক্ষীরা দেখিতেছিল।—৪৮]

[গগন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিরা বয়োবৃদ্ধদের ক্রম অনুসারে যখন চলিলেন তখন জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তির ন্যায় তাঁহারা শোভা পাইয়াছিলেন। ৪৯]

"প্রেম-প্রবাহিনী" কাব্যের "অন্বেষণ" নামক চতুর্থ সর্গের নিম্ন-লিখিত পংক্তিচয় 'মেঘদূত' কাব্যের কতিপয় শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছে। [১]

"হিমালয়-শৃঙ্গ কুবেরের অলকায়
ছড়াছড়ি মণি চুনী রয়েছে যেথায়।

১। কবির বানান এই উদ্ধৃতিতে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে।

যেখানেতে পথ সব সোনাদিয়ে বাঁধা
স্বর্ণ স্রোতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধাঁ ধাঁ।
নীলমণি-তরু শ্রেণী শোভে দুই ধারে,
অমর-প্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস-সরে সুবর্ণ কমল
মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল।
যক্ষ-যুবতীরা মিলি সলিল-ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়,
শতচন্দ্র খোসে পড়ে, আকাশ হইতে,
শতচন্দ্র শতদল ফোটে আচম্বিতে। ১

এরূপ উদাহরণ সহজেই আরও অনেক সঙ্কলন করা যাইতে পারে। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে কালিদাসীয় কাব্যের এই মুগ্ধ অনুসরণ (প্রকৃতপক্ষে এসকল অংশ কালিদাসের ভাবানুবাদ) স্বভাবতঃই কালিদাসের প্রতি কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—এই কথাটি আশা করি উপরের আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

বিহারীলালের কবিতার পথে কালিদাসীয় প্রভাব কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার আলোচনাক্রমে আর একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "বিজয়িনী" কবিতাটিতে বাণভট্টের কাদম্বরী ও কালিদাসীয় কাব্যের প্রতিবেশচ্ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু বিহারীলালের "কবিতা ও সঙ্গীত" গ্রন্থের ৬নং গীত হইতেও রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। সে গানটিতেও বিস্রস্ত-বসনা সুন্দরী মদন-বিজয়িনী।

১। কবির বানান এই উদ্ধৃতিতে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে

পাগল করিল রে তার আঁখিদুটি।
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি।
অধর থর থর
ফেটে পড়ে পয়োধর
নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি।
লুটিছে অঞ্চল
অনিলে চঞ্চল
মকর-কেতন চরণে লুটো পুটি।
দামিনী চমকিয়ে
পালিয়ে পালিয়ে
বেড়ায় ফাঁকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি' ছুটি'।
শয়নে স্বপনে
নয়নে নয়নে,
ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি-কুটি।

কিন্তু এখানে সুন্দরী যে মদন-বিজয়ী তাহা কেবল বাচ্যার্থে প্রকাশিত, ভাবানুষঙ্গে ব্যঞ্জিত নয়। সুতরাং ইহা যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবের উৎস এমন কথা বলা চলে না। এখানে প্রগল্‌ভ শারীর সৌন্দর্যের মাত্রাতিরেকই কাম-বিজয়ের হেতু, ইন্দ্রিয়াতিগ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্বরূপ নয়। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের "বিজয়িনী" কবিতা সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। আমরা শুধু বলিতে চাই যে কবিতাটিতে মদন-বিজয়িনী সুন্দরীর চিত্র কল্পনা রহিয়াছে তাহার প্রেরণা কবি এখান হইতে পাইয়া থাকিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু নয়।

কাব্যের শিরোনামে প্রসিদ্ধ কাব্যের উদ্ধৃতি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য ছিল এবং বিহারীলালের কাব্যেও

যাহার অনুবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম দিকের রচনায় তাহা অনুসরণ করিয়াছেন। 'বনফুল' কাব্যের নায়িকার চরিত্রের পূর্বাভাস দিতে গিয়া বালক-কবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক হইতে "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ" পংক্তিটি গ্রন্থের প্রথম পাতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কবি-কাহিনী'র নায়িকা 'কমলার' চরিত্র সৃষ্টিতে কালিদাসের শকুন্তলা, সেকস্‌পীয়রের মিরাণ্ডা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার প্রভাব রহিয়াছে। কালিদাসের প্রভাব বনপ্রকৃতির সহিত কমলার নিবিড় আত্মীয়তার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে বনপ্রকৃতির কোলে সে মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সে নিবিড় বেদনা অনুভব করিয়াছে। আবার প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা দ্বিতীয়বার আর কণ্ব-তপোবনে আসে নাই, কারণ "পূর্ব-পরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে।" (প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা।) সেই রকম 'কবি-কাহিনী'র কমলাও অপরিচিত সংসারের বিচিত্র বিধি-নিষেধের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া অরণ্যভূমিতে ফিরিয়াছে কিন্তু তাহার সহিত সেই পূর্বের-মিলন, সেই হৃদয়ের যোগ আর ঘটে নাই। অরণ্যের তরুলতা পশু-পক্ষী তাহাকে পর বলিয়া মনে করিতেছে। কমলা কবরী-বন্ধন খুলিয়া ফেলিল, পরিহিত বসন ত্যাগ করিয়া বল্কল ধারণ করিল, তথাপি সেই চিরআত্মীয়, সমবর্ধিত আরণ্যকেরা তাহাকে পরিহার করে,—হরিণ তাহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হয়, শুকপাখী তাহাকে দেখিলে উড়িয়া যায়।

এই শ্রেণীর যে প্রভাব তাহা স্থূল এবং পরোক্ষ। কবির প্রতিভা তখনও আপন পরিণামের পথে অগ্রসর হয় নাই। এই কাব্যের মূল্য যেমন অকিঞ্চিৎকর, এই জাতীয় প্রভাবও তেমনি। এই উদাহরণের

একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা তাহারই নিদর্শন, আর কিছু নয়।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যেও অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার সংলাপে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র কোন কোন চমৎকৃতিহীন সাধারণ পংক্তির সহিত অর্থগত সামঞ্জস্য প্রকট। আমরা এই জাতীয় সাদৃশ্যকে বর্তমান আলোচনায় প্রাধান্য দিই নাই এবং কালিদাসের রচনার কোন একটি পংক্তির পাশে রবীন্দ্রনাথের কোন একটা পংক্তিকে রাখিয়া অর্থ-সঙ্গতিকে বড়ো করিয়া দেখাইতে বসি নাই। আমাদের বর্তমান রচনার উদ্দেশ্যকে এক কথায় এই বলিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে, আমরা রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসীয় মানসের প্রভাব প্রদর্শন অঙ্গীকার করিয়াছি। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে আলোচ্য প্রভাব নির্দেশ করিতে গিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভাকে যেন কোন স্থলেই অস্বীকার না করিয়া বসি, আবার যেখানে প্রভাব প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সেক্ষেত্রে যেন রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা-হানির ভয়ে এবং তাঁহার কাব্যের প্রতি আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক অনুরাগের ফলে উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দ্বিধাগ্রস্ত না হই।

রবীন্দ্রনাথ যাহাই গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রতিভা দ্বারা আপনার সম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে বহুগুণ মূল্যবান করিয়া নূতন সৃষ্টিরূপে পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই স্থলে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান নিবন্ধে কালিদাসের রচনার সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার সাধর্ম্য যেখানে আমরা নির্দেশ করিয়াছি বা কালিদাস-মানস ও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সগোত্রতা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি সেখানে পাঠক যেন মনে না করেন যে তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন

করিবার চেষ্টা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকুঞ্জের বহু কাব্য-কুসুমের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে কাব্য তিনি রচনা করিয়য়াছেন তাহাতে পূর্বগত কবিগণের কাব্যের স্বাদ কোন কোন স্থলে মিলিলেই তাঁহার মৌলিকতার হানি হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ সঙ্গত নয়। কারণ তাঁহার সৃষ্টিতে যদি ফাঁকি না থাকে, তাহা যদি সত্যই কাব্য হইয়া উঠিয়া থাকে তবে কোন প্রকার অভি-যোগের কোন কারণই সেখানে থাকিতে পারে না। আর যদি তাহা কাব্য হইয়া না উঠিয়া থাকে তবে তাহার সমালোচনা নিরর্থক, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে উভয় রচনায় সাদৃশ্য থাকিলেও উহা যে উভয় কবির মৌলিক চিন্তা ও কল্পনার ফল এমনও হইতে পারে, এ কথাও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বস্তুতঃ মানবচিত্ত, এবং বিশেষ করিয়া কবি-চিত্ত, এমন রহস্যময় রাজ্য যেখানে যাহা কিছু বহির্বিশ্বের দৃষ্ট, শ্রুত, পঠিত ও অনুভূত বস্তু, ভাব ও চিন্তা তাহাদের মিশ্রসঞ্চয় রাখিয়া যায়, এবং কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন্‌টি কোন্ ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত, বা আদৌ সংগৃহীত কি না, নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। অতএব রবীন্দ্রমানসে কালিদাসের প্রভাবের কথা যখন আমরা বলিতেছি তখন কালিদাসের পূর্ববর্তিতা, কালিদাসীয় কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয় ও উভয় কবির রচনার ভাবসামঞ্জস্যের কারণেই উহা বলা হইয়াছে।

ভাবসামঞ্জস্য কথাটি যাহাতে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট না হয় এই কারণে যে অর্থে এখানে ইহার প্রয়োগ করিতেছি তাহা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কাব্যের প্রেম,

বিশেষ করিয়া বিরহ, প্রকৃতির রহস্যময়তা প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্র-নাথের কাব্যের অনুরূপ ভাব যেখানে তুলিত হইয়াছে সেখানে এই সকল ভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতার তারতম্য আছে। কালিদাসের কাব্যে যাহা অর্ধস্ফুটভাবে বা ক্লাসিকাল কাব্যসুলভ সাধারণীকৃত ভাবমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা প্রায় সর্বত্র ব্যাপক, গভীর, সূক্ষ্ম, পরিমার্জিত ও ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির স্পন্দনে আবেগময়, প্রাণ-চঞ্চল। এই কথাই এই নিবন্ধে বলা হইয়াছে। বহুস্থলে কালিদাসের কাব্যে যে ভাব ভ্রূণ অবস্থায় আছে পরবর্তী কবিগণের কাব্যে তাহা একটি সমৃদ্ধ ভাবকল্পনা, বা এমন কি তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণের 'প্রেমবৈচিত্ত্যের' ভাবকল্পনার ইতিহাস বিচার করিতে গিয়া এবিষয়ে এই নিবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। কাজেই 'ভাবসামঞ্জস্য' বলিলেই প্রকৃতি বা পরিমাণের দিক হইতে কোন ভাবের সমতা পাঠক বুঝিবেন না। কালিদাসীয় কাব্যের রসে তাঁহার চিত্ত এমন রসিয়া আছে, কালিদাসেরই চিত্ত-বৃত্তির সঙ্গে এমনভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থলে সেই প্রাচীন কাব্যের আবহাওয়া অবলীলাক্রমে আপন কাব্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। অনেক সময়ে তাঁহার কাব্যের কোন অংশের পাশাপাশি যখন কালিদাসের কাব্য হইতে কোন অংশ তুলিয়া বাচ্যার্থগত সামঞ্জস্যের অভাবে উভয় রচনার সম্পর্কে স্থূল-দৃষ্টি সমালোচকের প্রত্যয় উৎপাদন করা যায় না তখনও রসিক ব্যক্তি ঠিক বুঝিতে পারেন, কালিদাসের কাব্যের রসেই বিংশ শতকের কবির বাংলা কাব্য সে সকল স্থলে অভিষিক্ত হইয়া আছে। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দিয়া আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব। 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতাটির মূল বক্তব্যের সহিত

মেঘদূত কাব্যের কোন সংস্রব নাই, নিম্নোক্ত পংক্তিনিচয়ে মেঘদূতের কোন শ্লোকের ভাবানুবাদও পাওয়া যাইবে না। তথাপি ইহার উপকরণ মেঘদূত কাব্যেরই সম্পদ এবং বর্ণনার এই অলঙ্করণ-শিল্প (decorative art) একান্তভাবেই সংস্কৃতকাব্যসুলভ।

এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল
তোমার প্রাসাদ সৌধ, অনিন্দ্যনির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়ন তলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরী-বিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলতানে,
একান্তে কাটিবে বেলা, স্ফটিক-প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর। অদূরে অলিন্দ' পরে
পুচ্ছে পুচ্ছ বিস্তারিয়া স্ফীত গর্বভরে
নাচিবে ভবনশিখী ; রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা ; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে। অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

উপরে উদ্ধৃত অংশে প্রাচীন কাব্যের নাগরিক-জীবনের ছবি ও মেঘদূতের অলকাপুরীর বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

নিম্নোক্ত পংক্তিচয়ে কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে মহাদেবের উক্তিতে অপূর্ব কবিত্বময় রাত্রির বর্ণনার ছায়া সে তুলনায় স্পষ্ট নয় ; হয় তো কবি উক্ত অংশের কথা এই কবিতা রচনার কালে চিন্তাও করেন নাই ; কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা-ধর্মের প্রকাশ যে রহিয়াছে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতীদোলায়, পত্রচ্ছদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনাবিভোল
নিশ্বাসের প্রায়—মৃদুছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি সুরনরস্বপ্নাতীত—
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ-পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।—আবেদন

বস্তুতঃ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যের সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়াছেন মাত্র কিন্তু এই জাতীয় কবিতায় তিনি বাঙালী পাঠকের সংস্কৃতকাব্যের রসের প্রতি অভিলাষ জাগ্রত করিয়াছেন এবং নিজেই তাহার রসতৃষ্ণা বহু পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছেন।

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় (১—৩৭)

দ্বিতীয় অধ্যায় (৩৮—৭৮)

তৃতীয় অধ্যায় (৭৯—১০৬)

॥ গ্রন্থ-রচনাকল্পে কালিদাসীয় কাব্যের বিবিধ সংস্করণ আলোচিত হইলেও উদ্ধৃতির প্রয়োজনে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সংস্করণ ব্যবহার করা হইয়াছে। শ্লোকানুবাদ প্রায় সর্বত্রই গ্রন্থকারের; যে দুই-এক স্থানে অপরের অনুবাদ ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে অনুবাদকের নাম উল্লিখিত হইল। ॥

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টির যে অংশ কালিদাসের সহিত সবিশেষ সম্পর্কান্বিত তাহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ঃ—

১। কালিদাস ও তাঁহার কাব্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া রচিত কবিতা

২। কালিদাসের কাব্য হইতে আহৃত ভাব দ্বারা পুষ্ট কবিতা

৩। কালিদাসীয় কাব্যের উপমাদি অলঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত উপমাদি অলঙ্কার সম্বলিত কবিতা

৪। কালিদাসীয় কাব্য-প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত কবিতা

ইহার মধ্যে ভাব ও অলঙ্কারের প্রভাব চারি প্রকারের।

(ক) ভাবের দ্বারা ভাবের পুষ্টি ও প্রেরণা

(খ) ভাবের দ্বারা অলঙ্কারের প্রেরণা

(গ) অলঙ্কার দ্বারা ভাবের প্রেরণা

(ঘ) অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কারের প্রেরণা

বলা বাহুল্য এই প্রকারের শ্রেণী বিভাগ ব্যাবহারিক প্রয়োজনের সহায়ক মাত্র, নতুবা শ্রেণী-বন্ধের সংজ্ঞা ইহাদের প্রত্যেকটিই লঙ্ঘন করিতে পারে। ১-সংখ্যক শ্রেণীর কবিতাগুলি আমাদের আলোচ্য নহে; মাত্র দিগ্‌দর্শনের ব্যাপারে অঙ্গহানি দোষ বর্জনের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর উল্লেখ করা হইতেছে। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতা, চৈতালির 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব গান', 'মানসলোক',

'কাব্য', 'কালিদাসের প্রতি' প্রভৃতি কবিতা, 'উৎসর্গ' কাব্যের ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ নং ইত্যাদি কবিতা, কল্পনার 'স্বপ্ন' 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', ক্ষণিকার 'সকাল', সানাই-এর 'যক্ষ' প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীর।

এই শ্রেণীর কবিতার উপর কালিদাসের প্রভাব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে বিষয় হিসাবে কালিদাসের কাব্য-জগতের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়াই ইহাদের প্রকৃতি আলোচিত হইল না।

কালিদাসীয় কাব্য-জগতের সৌন্দর্য-লোকের পুনর্গঠনে ও রসপিপাসু কবি-চিত্তের অতীত যুগে সঞ্চরণের মধ্যেই এই সকল কবিতার কাব্যত্ব।

ইহাদের মধ্যে কালিদাসের সৌন্দর্যবোধের সার্থক অনুসরণ ও কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত সৌন্দর্য—ঐশ্বর্যময় জগতের পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছে এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া বিংশ শতকের কবির সৌন্দর্যব্যাকুল কল্পনাতুর চিত্ত নবীন সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুই কবির সৃষ্ট কাব্য-জগতে ভেদ এই যে পূর্বতন কবির কাব্যে যাহা অভ্যস্ত জীবনের স্থির অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহাই নব আবিষ্কারের বিস্ময়-চমকে গতিশীল, কল্পনা-রহস্যে নবচমৎকৃতিপূর্ণ, ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির চকিত আলোকে উদ্ভাসিত।

দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্রেণীর কবিতাবলির বিচারের পূর্বে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।[১]

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ কালিদাসের কালে, বিদ্বান্ ও বিদগ্ধ পাঠক ও শ্রোতৃ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া গড়িয়া

উঠিয়াছিল।[১] সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার, সমাস-বলে শব্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ, বিবিধ ছন্দের অকৃপণ আনুকূল্য তাহাকে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকার প্রদান করিয়াছিল। এই কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট রসের সৃষ্টি। শৃঙ্গারাদি রসগুলির কোন একটি প্রস্তাবিত রস শেষ পর্যন্ত কাব্যমধ্যে ফুটিয়া উঠিলেই সহৃদয় নাগরিকজন কাব্যকে তাহার উদ্দিষ্ট গৌরব প্রদান করিতেন। এই রস-সৃষ্টির ব্যাপারে চরিত্র-সৃষ্টির প্রসঙ্গ গৌণ হইলে কোন আপত্তি উঠিত না এবং কার্যতঃ চরিত্র-সৃষ্টি গৌণ ব্যাপারই হইত। সমরসাশ্রিত ও রসোত্তীর্ণ এক কাব্য হইতে অপর কাব্যের কাব্যত্বে পার্থক্য কোথায় প্রশ্ন হইলে সেকালের আলঙ্কারিক বিপদে পড়িতেন; তিনি খুঁজিতেন বিভাব অনুভাবাদির পার্থক্য কোথায়। কালিদাসাদি শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় 'নলোদয়ের' মত কৃত্রিমতা না থাকিলেও শব্দ-বন্ধে অলঙ্কার প্রয়োগ আজিকার দৃষ্টিতে বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ছিল।[২] অথচ সেকালের সমালোচক-সমাজ ইহাতে কবির শক্তিমত্তা ও কাব্যের উৎকর্ষ ব্যতীত তেমন কিছু গর্হিত দেখেন নাই।

আজিকার সমালোচকের দৃষ্টিতে অলঙ্কারের যেখানে আতিশয্য বলিয়া মনে হয় সেকালের কবি তাহা অবলীলাক্রমে তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর অঙ্গে পরাইয়াছেন ও তাঁহার রসগ্রাহী পাঠক সমাজের

১। The great poets of India wrote for audiences of experts; they were masters of the learning of their day, long trained in the use of language and they aimed to please by subtlety of effect.—Preface, A history of Sanskrit Literature. A. B. Keith.

২। রঘুবংশ কাব্যের যমকবহুল নবম ও অষ্টাদশ সর্গ ইহার উদাহরণ।

নিকট উহা অসহ বোধ হয় নাই। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উপমা-উৎপ্রেক্ষা আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। বস্তুতঃ সেকালে যাহা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা মূল আখ্যানকে বিশদ করিবার চেষ্টা নয়, চরিত্র-সৃষ্টির প্রতি অভিনিবেশ নয়, কাহিনীর অগ্রগতি ও সুসঙ্গতির প্রতি বিশেষ ঔৎসুক্য কাহারও ছিল না ; প্রতিটি সর্গ শব্দ অলঙ্কার-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতির বর্ণনায় পারিপাট্যপূর্ণ হইলেই হইল। মূল আখ্যানবস্তু অপেক্ষা কাব্যের অপর কোন অংশ অযথা দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইয়াছে, মূল প্রসঙ্গকে বর্ণ-বিরল করিয়া কোন অপ্রাসঙ্গিক আখ্যান বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন অভিযোগ কেহ তোলে নাই।

রসের প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদিও আট বা নয় রস আলঙ্কারিকগণের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে শৃঙ্গার রসেরই সর্বাধিক প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় ; বীর ও করুণ তদপেক্ষা গৌণ, অপরাপর রসের স্থান অকিঞ্চিৎকর।

কাব্যদেহের গঠনে শ্লোকের ভূমিকা বড়ই বিচিত্র। এক একটি সম্পূর্ণভাব এক একটি শ্লোকের মধ্যে ধরিতে হইত। অবশ্য একাধিক শ্লোকের মধ্যে যে একটি বাক্য কোন ক্রমেই প্রসৃত হইয়া ভাবের দীর্ঘতর প্রবাহ সম্ভব করিতে পারিত না এমন নয়, তবে সাধারণ স্বীকৃত নিয়ম ইহাই ছিল। এই কারণে শ্লোকবন্ধে ভাব সংহত হইত, কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস ইহার মধ্যে সম্ভবপর হইত না। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি শ্লোককে আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতে হইত। কবি প্রত্যেক শ্লোকটির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া সামগ্র্যের যথাযথতা, সুষমা ও সৌন্দর্যের প্রতি অভিনিবেশের অবকাশ পাইতেন না।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার রীতিতে সাদৃশ্য যেমন প্রচুর, বৈসাদৃশ্যও তেমনি প্রচুর। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে এখানে যেগুলি উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাংলা ভাষায় চারি চরণের শ্লোক-বন্ধের অসদ্ভাব তাহাদের অন্যতম। পয়ার-ত্রিপদীর বেড়া যেদিন ভাঙিয়াছে সেদিন বাংলা ভাষা নূতন সম্ভাবনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে আর্যা অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি হ্রস্ব-চরণ-বিশিষ্ট শ্লোক অপেক্ষা স্রগ্ধরা—শার্দূলবিক্রীড়িত—মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি দীর্ঘচরণ-সম্বলিত শ্লোকের সহজেই ভাব প্রকাশ শক্তি বিপুলতর ছিল, এবং একথা সাধারণভাবে স্বীকার্য যে বাংলার মত বিশ্লেষণমূলক ভাষার দুই চরণের পয়ারবন্ধ অপেক্ষা এই সকল হ্রস্বচরণ বিশিষ্ট শ্লোকবন্ধেও ভাবগাঢ়তা সর্বথা অধিক পরিমাণে ছিল।

ভাষাশক্তির প্রভেদ হইতে কাব্য-লক্ষণের পার্থক্যে আসিলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে সর্গবন্ধ কাব্যের ধারা বাহিয়া আমরা গীতি-কবিতার যুগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। এই গীতি-কবিতার বহুতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ইহার ভাবের অখণ্ডতা ; একটি কবিতায় একটি মাত্র ভাবের প্রকাশ ইহার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিচিত্তের স্পন্দন ইহার মধ্যে ধরা পড়িবে। মহাকাব্য কেন, সে-কালের কোন শ্রেণীর কাব্যেই কবির ব্যক্তিচিত্তের সহজ অনুভূতির সুরটি ধরা পড়িবার কোন অবকাশ ছিল না; সকল কাব্যই এ দিক দিয়া সমান বৈচিত্র্যহীন ছিল, তৃতীয়তঃ গীতি-কবিতায় যে উচ্ছলতার প্রকাশ লক্ষিত হয় সেকালের কাব্যে তাহারও অবকাশ ছিল না। ভাবের সর্বজনীন সাধারণ আবেদনই প্রাচীন কাব্যের বিশেষত্ব ছিল। প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রতিটি শ্লোক তথা প্রতিটি সর্গ—সুষম, সুগঠিত, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, কিন্তু নিস্তরঙ্গ, উচ্ছ্বাসহীন,

গতানুগতিক। যে রসের প্রকাশ সেখানে লক্ষ্য তাহা সিদ্ধ হইলেই কবির দায়িত্ব ফুরাইল। প্রকৃতপক্ষে সেকালের সংকাব্য-মাত্রেই সূত্রগ্রথিত বজ্র-সমুৎকীর্ণ মণি ছাড়া আর কিছু নয়, "নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।"[১]

প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যক উল্লিখিত কবিতাশ্রেণীর কবিতাবলির আলোচনাকালে আমাদের উভয় ভাষার কাব্যের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখিতে হইবে।

প্রভাব বিচারের সূত্র

কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে কাব্যের উপজীব্য ভাবের মূল্য অধিক কি প্রকাশভঙ্গীর মূল্য অধিক, এবং ভাব হইতে প্রকাশভঙ্গীকে কি পরিমাণে পৃথক করিয়া দেখা যাইতে পারে অথবা আদৌ এই প্রকার কোন পৃথক্‌করণ সম্ভবপর কি না এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকিলেও একথা সর্ববাদিসম্মত যে প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা ভাবের আয়ু দীর্ঘতর। কাব্যের গঠন, ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দচয়ন, কবিপ্রসিদ্ধি, রচনারীতি ইত্যাদি ভাব ছাড়া কাব্যের যাবতীয় উপকরণকে আমরা প্রকাশভঙ্গীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিব। 'ভাব' বলিতে আমরা রত্যাদি ভাবের কথা বুঝিব না, aesthetic ভাব বা mood অথবা কবি-মানসের এক বিশেষ কাব্যোচিত দৃষ্টি অর্থে আমরা এই অধ্যায়ে শব্দটির প্রয়োগ করিব। 'তত্ত্ব' অর্থেও এখানে এবং পরবর্তী অধ্যায়-সমূহে শব্দটি প্রযুক্ত হইবে।

কালিদাসের কাব্যাবলি কী কী ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে এ প্রশ্নের উত্তর দুরূহ এবং আমাদের আলোচ্যও নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

১। কাদম্বরীচিত্র—রবীন্দ্রনাথ।

কালিদাসের কাব্যের কোন্ কোন্ ভাব কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কালিদাসীয় কাব্যের কোন্ কোন্ ভাবকে তিনি কাব্যের প্রেরণা হিসাবে উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এ প্রশ্ন জটিল নয়। এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে কালিদাসের কাব্যের কোন্ তত্ত্ব কোন্ সমালোচকের নিকট কী অর্থ বহন করিয়াছে তাহা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ কী অর্থ সেখানে খুঁজিয়া পাইয়াছেন রবীন্দ্রকাব্যের বিচারে তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এইস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে যেখানে আলোচ্য বিচারের প্রসঙ্গে কোন বিশিষ্ট সমালোচকের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন আত্মসমালোচনার মতভেদ পরিদৃষ্ট হইবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত, এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ নীরব অথবা তাঁহার কাব্যের সহিত তাঁহার আলোচনার বিরোধ ঘটিবে সেখানে রবীন্দ্রনাথের আপন উক্তি অপেক্ষা তাঁহার কাব্যকেই প্রামাণ্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব।

প্রভাব-বিচারে কালাতিক্রমণ দোষ পরিহার

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কালিদাসের কাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের যুগের দৃষ্টির আলোকে যেন কালিদাস যে-কথা কোন শ্লোকে বলিতে চাহিয়াছেন তাহাকে বিশেষিত না করি অথবা সম্পূর্ণ অর্বাচীন কালের ভাব ও চিন্তা তাঁহার কাব্যের উপরে আরোপ না করি। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'যক্ষ' কবিতা এবং 'প্রাচীনসাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে পারি। 'যক্ষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

'নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্যভূমে—
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।”

সৌন্দর্যের অপূর্ণতার মধ্যে নব সৌন্দর্যের আবিষ্কার একান্তই আধুনিক কল্পনার ফল। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কালিদাসের 'মেঘদূত' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে নিখিল মানবের বিরহার্তি অনুভব করিয়াছেন তাহাতেও সম্পূর্ণ আত্মতন্ত্রী ও বহুল পরিমাণে মূলকাব্য-নিরপেক্ষ চিন্তা ও কল্পনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে সমালোচকের সম্মুখে যে সমস্যাটি উপস্থিত তাহা এই যে কালিদাসের কাব্যে এই অর্থ রহিয়াছে কি না, এবং রবীন্দ্রনাথকে যখন এই রকম ভাব-কল্পনার পথে কালিদাসীয় কাব্য প্রেরণ করিয়াছে তখন তাহাকে এক প্রকার প্রভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কি না।

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে এই ধরনের আরো একটি উদাহরণ (গ্রন্থ-মধ্যে উক্ত উদাহরণটির বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিয়াছি) প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত করিতেছি। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতে মহাদেবের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কুমারসম্ভব হইতে আহৃত বটে কিন্তু কুমারসম্ভবের যে-মহাদেব তপোবিঘ্ন-কারণ স্ত্রীজনের সঙ্গ হইতে দূরে স্বগণসহ প্রস্থান করিয়াছিলেন 'তপোভঙ্গ' কবিতার মহাদেবের সহিত তাঁহার চারিত্রিক বৈষম্যই প্রবল। এক্ষেত্রে আমরা কালিদাসের প্রভাব স্বীকার করিব কি?

বস্তুতঃ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পার্থক্য বা মৌলিক চিন্তা-কল্পনার সৌকর্য এই সকল ক্ষেত্রে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিলেও পূর্ববর্তী কবির কাব্যোপাদান এখানে পরবর্তী রচনার শুধু অনুপ্রেরণার কারণ নয়, কাব্যের উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'ভূমিকা' অংশে কাব্য-প্রভাবের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারণার বহির্ভূত যে শ্রেণী-সমূহের নির্দেশ করিয়াছি, তাহার সম্যক্ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে ব্যর্থ অনুকরণ ব্যতীত যে-ক্ষেত্রেই পরবর্তী লেখক নূতন সৃষ্টির চিন্তা-কল্পনা বা রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে প্রেরণা পাইয়াছেন সেই ক্ষেত্রেই, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, স্বল্প হউক বা অধিক হউক, পূর্ববর্তী কবির প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রভাব পরবর্তী লেখকের রচনার মৌলিকতা আচ্ছন্ন করিতে পারে, না-ও করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মৌলিকতা এ সকল ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন হয় নাই। পূর্ববর্তী কবির কাব্যের উপজীব্য ভাবের গভীরতর বা ব্যাপকতর প্রকাশের দিকে কবির অভিনিবেশ নয়। কবি নবীন ভাবের সন্ধানে নিবিষ্ট।

এই প্রসঙ্গের আলোচনা সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যে-ক্ষেত্রে কালিদাসের কাব্য হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন সে-ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে তাহাকে প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু কালিদাসীয় কাব্যের কোন অংশে পরবর্তী যুগের কোন ভাবের প্রকাশ কল্পনা করিয়া তাহার আলোকে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাকে পরীক্ষা করিবার বিরুদ্ধে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিব।

বর্তমান আলোচনায় কালিদাসের কোন্ শব্দের বা কোন্ পংক্তির সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন্ পংক্তির বা তদংশের স্থূল সাদৃশ্য বর্তমান তাহার তালিকা রচনায় আমরা প্রবৃত্ত নই।

অথবা যেখানে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা কালিদাসের কোন কাব্যের পাঠের দ্বারা অনুপ্রেরিতমাত্র তাহাকেও আমরা প্রভাব বলিয়া স্বীকার করিব না। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে। 'মানসী' কাব্যের 'ভাল করে বলে যাও' কবিতাটি রচিত হয় ১২৯৭ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ এবং ওই তারিখেই 'মেঘদূত' কবিতাটির রচনা আরম্ভ হয় ও পরের দিন সেটি সমাপ্ত হয়। কাজেই উভয় কবিতা একই সময়ে রচিত। সমকালীন রচনায় অনেক সময়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব-সাদৃশ্য এবং প্রেরণার ঐক্য যে থাকে ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। এখানে রসের বিচারে 'ভালো করে বলে যাও' কবিতাটির কেন্দ্রে রহিয়াছে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার; ব্যভিচারী হিসাবে সম্ভোগের উপস্থাপনা হইয়াছে মেঘাবৃত রজনী উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছে, এবং যে হেতু 'মেঘদূত' কবিতাটিও ওই একই দিনে রচিত অতএব কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাবে 'মানসী' কাব্যের 'ভালো করে বলে যাও' কবিতাটি রচিত। এই শ্রেণীর প্রভাবকে আমরা বর্তমান রচনায় স্বীকার করিব না, কারণ অন্তরে যাহাকে সত্য বলিয়া জানা যায় উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তাহা বিচারের সত্য বলিয়া স্বীকৃত নাও হইতে পারে।

কালিদাসের কাব্য হইতে আহৃত ভাব দ্বারা পুষ্ট রচনা

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি ও মানবচিত্র (১ম পর্ব)

কালিদাসের কাব্যে মানুষ ও প্রকৃতি, তরুলতা-জীব-জন্তু-অরণ্য-পর্বত সকলে মিলিয়া একই সংসারের সমান অংশী হইয়া আছে। পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভয়-ভালোবাসা প্রেম-অভিমান লইয়া তাহারা,

জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে নাই। প্রকৃতি-বর্ণনায় বা মনুষ্য জীবনের উপস্থাপনায় পারস্পরিক উপমাদির প্রয়োগ কেবল গতানুগতিক রীতিকে অনুসরণ করে নাই, উভয়ের মধ্যে অন্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রকৃতি যেখানে মানুষের বিরহ-মিলনের পটভূমিকারূপে প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছে সেখানেও সে কোথাও কোণঠাসা হয় নাই, বরং ব্যাখ্যাতীত এক রহস্যময় আত্মীয়তা উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সবিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে এবং কাব্যের মাধুর্য অনেকাংশে প্রকৃতির উদার অপরিমেয় ঐশ্বর্যলোক হইতে আহৃত হইয়াছে। কালিদাস সংস্কৃত কাব্যের এই ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই আমাদের এই প্রতীতি জন্মিবে যে কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি মানবচিত্তে এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করিবার পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই সৃষ্টি আমাদেরই জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মোহন মায়ায়ই সম্ভবপর হইয়াছে, আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃত কোন জগতের অপর কোন রহস্যময় পথে নয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ-পঞ্চম অঙ্কে প্রকৃতির উপস্থাপনা যে গতানুগতিক মোটেই নয় এবং এক কথায় 'প্রকৃতিতে মানব ধর্মের আরোপ হইয়াছে' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না, উহার প্রভাব যে দূরপ্রসারী ও পুনঃ পরীক্ষণ-যোগ্য এই কথাটি প্রথমে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির প্রভাব কালিদাসের কাব্য হইতে কী-ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিব।

প্রথম অঙ্ক হইতে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত শকুন্তলাকে যখনই আমরা রাজার দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছি তখনই তাহাকে প্রকৃতির অংশীভূতরূপে চোখে পড়িয়াছে এবং প্রকৃতির রূপ সেখানে উন্মাদন। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার

"অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥"

বন-প্রকৃতির রূপও সেখানে উপভোগক্ষম। বন-জোৎস্নার নিকটে গিয়া শকুন্তলা বলিতেছে, 'হলা রমণীএক্‌খু কালে ইমস্‌স লদাপাঅবমিহুণস্‌স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্‌খমো সহআরো।"

চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা-বিরহের সম্ভাবনায় বিধুর বনভূমির সজ্জাহীন বৈরাগিণী মূর্তি।

"উগ্‌গলিঅ-দব্‌ভ-কঅলামআ পরিচত্ত—ণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅ—পণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥"

বনজ্যোৎস্নাকে যে শুধু কিশোরী শকুন্তলারই বিদায়কালে মনে পড়িতেছে তাহা নয়; স্বয়ং তপোমূর্তি কাশ্যপ বলিতেছেন,—

"সংকল্পিতং প্রথমমেবময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়—
মস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বাতচিন্তঃ॥'

বনজ্যোৎস্না বা শকুন্তলার রূপ সম্পর্কে অনসূয়া—প্রিয়ংবদার মুখেও কোন কথা কবি দেন নাই। বন-প্রকৃতি যে এখানে রূপ-

রসাদি পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ হইতে ক্রমশঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের বিষয়ীভূত হইতেছে এই তত্ত্বটিই এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে কালিদাস মানবের অন্তরের রহস্যময় অনুভূতির উত্থান বিলয় ও অর্ধ-জাগ্রৎ অবস্থার সঞ্চারে প্রকৃতির যে অলক্ষ্য সংক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশ সহকারে প্রণিধানের যোগ্য। নেপথ্যে ভাগ্যহীনা হংসপদিকা গান করিতেছে,—

"অহিণঅমহু লোলুবো তুমংতহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমল-বসতিমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং॥"

বিদগ্ধ রাজা বিদূষকের নিকটে গানের ব্যাখ্যা করিয়া হংস-পদিকার কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তাহাকে গিয়া বল, যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছি।"

এইবার রঙ্গমঞ্চে দুষ্মন্ত একাকী। রাজা বলিতেছেন, "(আত্ম-গতম্)—কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।"

শ্লোকটির অর্থের সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। হংস-পদিকার গান ও রাজার মুখে প্রিয়জন-বিরহ-প্রসঙ্গমূলক উক্তি দ্বারা শকুন্তলা-প্রত্যাখানের উপযুক্ত ভূমিকা কবি সূক্ষ্ম সংকেতে প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যতর কয়েকটি গূঢ় তত্ত্ব এই শ্লোকের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

প্রথমতঃ নয়নাভিরাম দৃশ্য শ্রুতি-মধুর ধ্বনি মানুষকে উৎকণ্ঠ করিয়া তোলে, সুখ-নিমগ্ন হইলেও তাহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়, অন্তরে বিষাদচ্ছায়া ঘনাইয়া আনে। এই বিষাদ প্রিয়জন-বিরহের বিষাদ। দ্বিতীয়তঃ 'জননান্তর-সৌহৃদানি' কিসের ? ইষ্টজনের সহিত যে এই পদের অর্থগত অন্বয় করিতেই হইবে তাহাই বা কেন ? আমাদের মনে হয় 'রম্যাণি' ও 'মধুরাঃ শব্দাঃ' ইহাদের সহিত সম্পর্কিত চেতনাকে 'জননান্তর-সৌহৃদানি' পদের সহিত অর্থের দিক হইতে অন্বিত করা যাইতে পারে। এইভাবে অন্বিত হইলে শ্লোকটির নূতনব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। সে-ব্যাখ্যা পূর্বসূরিগণ-কৃত উক্ত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার বিরোধী নয়, বরং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও গভীরার্থ। নয়নাভিরাম দৃশ্যের দর্শনে ও শ্রুতি-মধুর ধ্বনির শ্রবণে সুখনিমগ্ন ব্যক্তির চিত্ত যে ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহাতে মনে হয় নিশ্চয়ই তাহার অগোচরে অনায়াসসিদ্ধরূপে সংস্কার বশে ইহাদের সহিত জন্মান্তরের সম্পর্ক তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

এই ব্যাকুলতা, এই বিরহ-বোধ চরম সুখের মধ্যেও জাগরূক। সুন্দরী, রম্যদৃশ্যময়ী, গীতময়ী, মধুরশব্দময়ী পৃথিবীর প্রতি তাকাইয়া ব্যাখ্যাতীত অনির্বচনীয় বেদনায় মন ভরাক্রান্ত হইয়া ওঠে—এই কথাটি এখানে আছে। এই ব্যাখ্যার ফলে দর্শন—শ্রুতিপথে প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রসৃত হয় এবং মানবের অন্তরসত্তা পৃথিবীর সহিত এক বিচিত্র একাত্মতা লাভ করে। আমরা এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলিতে চাই। দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কালিদাস সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই অনুক্ত তিন বিষয়েরও তিনি উল্লেখ করিতে পারিতেন। মাত্র দুইটির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন

পঞ্চবর্গের প্রতিভূরূপে। তবে যে অপর তিনটির কোনটির উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব এই পঞ্চকের মধ্যে চেতনার উপর ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য দর্শন ও শ্রবণ অপেক্ষা স্পর্শনের ফল অধিকতর স্পষ্ট, প্রখর ও স্থায়ী। কিন্তু আমাদের মনে হয় ভবভূতিতে স্পর্শন অনুভূতি যেরূপ প্রাধান্য পাইয়াছে কালিদাসের কাব্যে তাহা পায় নাই; দর্শন ও শ্রবণেরই সেখানে প্রাধান্য। ইহার অবশ্যই কারণ আছে, বিশেষ করিয়া এই শ্লোকে। অনুভূতি মাত্রেই সূক্ষ্ম কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি শ্রেণী বিভাগ করা হয় তবে স্পর্শন অবশ্যই দর্শন ও শ্রবণ অপেক্ষা স্থূলতর অনুভূতি বলিয়া স্বীকৃত হইবে। লোকান্তরের সহিত সম্পর্ক প্রকৃতির যোগসূত্র অবলম্বনে যখন অনুভূত হইতেছে তখন স্পর্শন অপেক্ষা কবি দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্বকে অতি স্বাভাবিক কারণে প্রাধান্য দিয়াছেন। বলা বাহুল্য আস্বাদনের স্থূলতাও এই কারণে বর্জিত হইয়াছে এবং আঘ্রাণের যে উল্লেখ নাই সে এই কারণে যে মনুষ্যেতর প্রাণীরই উহা অপেক্ষাকৃত প্রবল সহজ বৃত্তি। **অতএব এই শ্লোকটি দ্বারা কবি গোচর ও অগোচরের মধ্যে, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে, লোক ও লোকান্তরের মধ্যে মানবচিত্তের রহস্যময় অবচেতনাদ্বারা সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছেন।**

রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবটির অভিনব সম্প্রসারণ লক্ষিত হয়। কোন কোন সমালোচক এই কবিতায় ভূগোল-ভূতত্ত্বাদির কাব্যরূপ দর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিকে বুঝিতে হইলে তত্ত্বের যৌক্তিকতায় নয়, এই অর্ধচেতনার রহস্যময় আলোকে, বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রশস্ততর ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জন্ম-জন্মান্তরে পৃথিবীর সহিত যে

যোগ ছিল বহু লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলে আজ সেই সংযোগ নূতন পরিণতি লাভ করিয়া ছিন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু কবিচিত্তে সেই সম্পর্ক, সেই 'জননান্তর-সৌহৃদানি' আজিও কোন কোন দুর্লভ মুহূর্তে সুন্দরী পৃথিবীর দৃশ্যশ্রব্যাদি ঐশ্বর্যের মায়াময় পথে জাগিয়া ওঠে।

"তাই আজি কোনদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র—'পরে
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, **জাগে মহাব্যাকুলতা**
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব-নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।"

এই 'মহাব্যাকুলতা', পর্যুৎসুকতা, উৎকণ্ঠা—ইহারা সমার্থক। উৎকণ্ঠার লক্ষণ

"রাগে ত্বলব্ধ,'বিষয়ে মহতী বেদনা তু যা।
সংশোষণী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ॥"

ঔৎসুক্য-লক্ষণ

"কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টবস্তুবিয়োগতঃ।
তদ্দর্শন-রম্যবস্তুদিদৃক্ষাদেশ্চ" —"

সুধাকর.

উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে দৃশ্য বস্তুর রমণীয়তা হইতে বহুদূর অতীত জন্মের স্মৃতির জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত স্তবকের পরবর্তী পংক্তিনিচয়ে ধ্বনি-জগতের দ্বারা স্মৃতি-জাগরণ সূচিত হইতেছে—

"ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার। দূর কর সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকালে, যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে ;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী—'পরে

শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল।”

“ইষ্টবস্তুবিয়োগতঃ” যে “মহতী বেদনা”, পুনর্মিলনের জন্য যে “কালাক্ষমত্ব” তাহাই এই কাব্যাংশের প্রাণ।

চিত্রার ‘উর্বশী’ কবিতায়ও এই ভাবের অনুবৃত্তি। অনন্ত সৌন্দর্যের রাজ্য হইতে মানুষের নির্বাসন ঘটিয়াছে কিন্তু সৌন্দর্যের ক্ষণিক আবির্ভাবের মুহূর্তে নির্বাসনের দুঃখ অন্তরে পূর্বকথিত বিষাদ ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে।

“তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।
পূর্ণিমা-নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ’তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।”

কালিদাসের শ্লোকে এই বিচিত্র অনুভূতির যে অধিকারী তাহাকে বুঝাইবার জন্য কর্তৃবাচক “জন্তু” পদটির প্রয়োগ রহিয়াছে। টীকাকারগণের মধ্যে ইহার অর্থ, কেহ করিয়াছেন “জন্তুঃ প্রাণি-মাত্রম্”, কেহ বলিয়াছেন, “জন্তুঃ শরীরী”। প্রধানতঃ মানববাচক হইলেও সমগ্র প্রাণিজগতের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মহা-কবির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই শব্দটির প্রয়োগে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ভাবটির যে প্রয়োগ লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহা তাঁহার প্রথম দিকের একটি গদ্য রচনায় বিষয়রূপে

গৃহীত হইয়াছিল দেখিতেছি এবং সেখানে এই ভাবটি যে কবিচিত্তেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ভাবুক মাত্রেরই এই অনুভূতি ঘটিয়া থাকে এই কথার উল্লেখ আছে। রোম্যান্টিক মানসের এই বিষাদের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই প্রকার,—

"ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব অনুভব করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ·········কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে দূর হইতে সংগীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদেব হৃদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে? [বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা। অপ্রচলিত সংগ্রহ, ১ম]

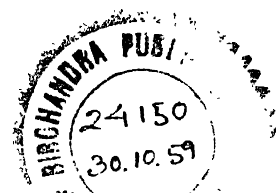
এই পর্যুৎসুকতার কথা, এই বিচিত্র বিরহবোধের কথা কালিদাস যে শকুন্তলার "রম্যাণিবীক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকে এবং মেঘদূতের "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ" ইত্যাদি শ্লোকাংশেই বলিয়াছেন তাহা নয়, ঋতুসংহারে,[১] বিশেষ করিয়া 'বর্ষা-বর্ণনা'য় কবি বার বার বলিয়াছেন। তবে সে শ্লোকগুলি ব্যাখ্যান্তর-সাপেক্ষও বটে।

১। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'ঋতুসংহার' কালিদাস-প্রণীত কাব্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উহাকে কালিদাস-বিরচিত মনে করিতেন বলিয়া এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে আমরা নির্বিচারে কবির মতই গ্রহণ করিব।

'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে উদ্ধৃত অংশে যে কবিত্বের প্রকাশ রহিয়াছে তাহা উচ্চাঙ্গের, কিন্তু সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত নই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে কালিদাসের বক্ষ্যমাণ শ্লোকটিতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়ী পৃথিবীর সহিত মানবচিত্তের যে রহস্যময় আত্মীয়তা ও বিচিত্র বিরহবোধের ভাব আছে তাহাই এখানে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে পূর্বোক্ত ভাবটির নবীন, বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পরিবেষণ লক্ষিত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে এই ভাবটি দীর্ঘকাল বাসা বাঁধিয়াছিল এবং তাঁহার বিবিধ সময়ের বিবিধ রচনায় ইহার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহার প্রথম স্ফুরণ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে; 'স্মৃতি' কবিতাটি তাহার প্রমাণ। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই, প্রকৃতির পরিবর্তে প্রিয়াদেহ এখানে জন্মান্তর-স্মৃতির উদ্বোধন ঘটাইয়াছে।

"ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জনমের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ—



সেই হাসি সেই অশ্রু সেই—সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ,
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।”

উল্লিখিত গদ্য রচনাংশে যাহাকে কবি বলিয়াছেন ‘বিষণ্নসুখ’, ‘কোমল বিষাদ’, ‘অপ্রখর সুখ’ ইহাই এই কবিতায় অন্তিম দুই চরণে প্রকাশমান এবং রোম্যাণ্টিক “জননান্তর-সৌহৃদানি’র কল্পনা এই কবিতার মূল প্রেরণা।

‘মানসী’র ‘অনন্তপ্রেম’ কবিতায়ও এই ভাবটির অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া অতীতলোকে মানস-বিহার ইহার উপজীব্য।

“আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাঁজে॥”

‘মানসী’র ‘কুহুধ্বনি’ কবিতায় কবি লিখিতেছেন—

“নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান,
দেশকাল করি অভিভব।

অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে,
লভিতেছে নূতন পরাণ।”

এখানে সুদূর অতীত যুগ হইতে বর্তমান পর্যন্ত যে জীবনধারা প্রবাহিত কবি তাহার মধ্যে আপন সত্তাকে অনুভব করিয়াছেন এবং এই অনুভূতির জাগরণে স্মৃতির যে পুনরুদ্বোধন ঘটিয়াছে তাহা ওই কুহুধ্বনিদ্বারা সাধিত হইয়াছে।[১]

“সোনার তরী” কাব্যের ‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতায়াও ‘পৃথিবীর শিশু’ কবির এই বিচিত্র আত্মীয়তা-বোধের কথা রহিয়াছে :—

“মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ[২]। মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব কলতান অবিশ্রাম অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী—’পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন

১। প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য যে ভারতীয় দর্শনে, কাশ্মীরের শৈব সম্প্রদায় কর্তৃক প্রবর্তিত মতে, স্মৃতির এই প্রকার উদ্বোধনের ফলে জীব নিজেই যে ঈশ্বর এই সত্যে গিয়া পৌঁছাইতে পারে। সোমানন্দ, উৎপলদেব, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি এই মত পোষণ করিয়াছেন। এই মত ‘প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন’ নামে খ্যাত।

২। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ‘ভুবন-ভ্রূণে’র কল্পনা কালিদাসের কাব্যে আছে। এ কথা বলা হইতেছে না যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে

তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ বাতাসের মতো
জাগে যেন শিরায় শিরায়..................
....হৃদয়ে আমার
যুগান্তর স্মৃতি সম উদিত হতেছে বারম্বার ॥

উৎসর্গ কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতায় প্রাগুক্ত বিরহবোধের প্রকাশ স্পষ্ট।

"রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে ফুল সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন বিহীন মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পরিনি তাদের আপন করিতে
তারা নিশিদিন জাগাইছে চিতে বিরহ বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদের হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে ॥

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে

এ স্থলে প্রেরণা পাইয়াছেন, তথাপি রজনীর অন্তঃপ্রবিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে কালিদাস যে জরায়ু-মধ্যগত ভ্রূণ কল্পনা করিয়াছেন ইহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

নোর্ধ্বমীক্ষণগতি র্ন চাপ্যধো নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ।
লোক এষ তিমিরোল্ববেষ্টিতো গর্ভবাস ইব বর্ততে নিশি ॥"

কুমার ৮।৫৬

[ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি চলে না, নিম্নেও নয় ; পার্শ্বে নয়, সম্মুখে নয়, পশ্চাতে নয়। তিমিররূপ জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া জগৎ যেন রাত্রিতে গর্ভবাসে অবস্থান করিতেছে।]

যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে ॥[১]

ডারউইনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদ ও হিন্দুর জন্মান্তরবাদ এই সকল কবিতার মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে কি না অথবা কী পরিমাণে

১। তুলনীয়ঃ—(ক) ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্ ক্রুসো, পৌল বর্জিনি প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারি উদাসীন হয়ে যেত। এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে! এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারিনে—এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারিনে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী-শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে॥" —ছিন্নপত্র ১৩৪৫ পৃঃ ১৬৩—১৬৪

(খ) আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।······তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্প অল্প মনে পড়ে।"

—ছিন্নপত্র পৃঃ ১৭০—১৭১

জোগাইয়াছে এ প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ কর্মফল-সংশ্রয়ী, অতএব তাহাকে এখানে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে চেতনা কবির ছিল, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে বটে কিন্তু কবিতার কাব্যত্ব নির্ভর করিতেছে কালিদাসীয় কাব্যসুলভ উক্ত বিরহবোধের উপর, ডারউইনের তত্ত্বের সহিত যাহার কিছু মাত্র যোগ নাই।

'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' নামক বিখ্যাত কবিতায় 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতার যুগ-যুগান্তরে প্রবহমান স্মৃতির রোম্যান্টিক কল্পনা প্রথম সূচিত হইয়াছে। অহল্যার সুপ্তি, স্বপ্ন, অস্পষ্ট-চেতনা, পরিম্লান স্মৃতি ও নব পরিচয়ের মধ্যে জাগরণ এই ক্রমিক অবস্থানিচয়ের বর্ণনা তাহার উদ্বোধন-বিষয়ক এই কবিতাটিতে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে।

কবি প্রথমেই বলিতেছেন,—

কী **স্বপ্নে** কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,

তারপরে

ছিল কি পাষাণতলে **অস্পষ্ট চেতনা**।

তারপরে

জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় **অর্ধ জাগরণে**।

তারপরে

সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রি সুশীতল **বিস্মৃতি-আলয়ে**

তারপরে

বিস্মৃতিসাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো **উঠিয়াছ** ধ'রে।

অন্তিম দুই চরণে ঃ—

অপার রহস্যতীরে
চিরপরিচয় মাঝে নব পরিচয় ॥

অতীতস্মৃতির যে সংস্কার চিত্তে স্থায়ী বৃত্তিরূপে অবস্থান করিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা এই কবিতায় প্রথম সূচিত হইয়াছে।

এই স্থলে 'জননান্তর-সৌহৃদানি' কথাটির অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভবপর কি না দেখা যাক। দুষ্মন্ত 'ইষ্টজনবিরহ' না ঘটা সত্ত্বেও বিরহ-বিষাদ অনুভব করিয়াছেন—তাহা অসংঘটিত অথচ আসন্ন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের পূর্বছায়াপাত-জনিত। "দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপঃ" ও হংসপদিকার সঙ্গীত—এই দুইয়ের মধ্যে মাধুর্যের যে সহজ সংশ্রব ছিল তাহাই তাঁহার বর্তমান শকুন্তলা-বিরহিত জীবন ও আশ্রমপদের শকুন্তলা-মিলন-তৃপ্ত জীবন এই উভয়কে (দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে)। অলক্ষ্য সেতুবন্ধনে সংযুক্ত করিয়াছে। মালিনীতীরস্থ কণ্বাশ্রমে তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত জীবনের কথা, সে আনন্দের কথা, আজ এই জীবনে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, তবে সঙ্গীতের পথে সে-জীবনের ছবি যেন এ-জীবনের 'বাতায়নে কখনও উঁকি মারিয়া যায়, অথচ পূর্ণ স্মৃতির উদয়ের অভাবে পূর্বের আনন্দ সঞ্চারিত করিতে না পারিয়া বিফলতা-জনিত বিষাদের মেঘচ্ছায়ায় বর্তমান জীবনকে আচ্ছন্ন করে। পূর্বোদ্ধৃত—

"বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত অন্তরখানি লইতে অন্তরে
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী—'পরে
শুভ্রশান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি।
কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদ-ব্যাকুল।"

এই পংক্তিনিচয়ে যে রোম্যান্টিক পর্যুৎসুকত্ব, 'ইষ্টবস্তুবিয়োগতঃ কালাক্ষমত্বম্', তাহার মূল উৎস এইখানে। এই দুই জীবনের অস্তিত্বই দুষ্মন্ত একদেহে অনুভব করিয়াছেন, দেহান্তর-পরিগ্রহ এই জন্মান্তর-পরিগ্রহে প্রয়োজন হয় নাই। তত্ত্ব হিসাবে এই কথাটি আধুনিক বিজ্ঞান আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রাণিদেহে জীবকোষগুলি প্রতি মুহূর্তে লয় পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হইতেছে। প্রতি সাত বৎসরে পুরাতন জীবকোষেব লয় ও নূতন গুলির উৎপত্তি সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সত্য অনুভূতির ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। "এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর"[১] পংক্তিটি ভগবৎ-প্রেম যে কবিকে নূতন নূতন অনুভূতির ক্ষেত্রে নিয়া গিয়াছে ও জীবনকে চিরন্তন নবীনতা প্রদান করিয়াছে এই কথাটি প্রকাশ করিতেছে। অন্তরের অনুভূতির দিক দিয়া একই মানুষের পক্ষে জন্মান্তরের নবীনতা ও বৈচিত্র্য যে

১। "গীতিমাল্য" কাব্যের "সুন্দর" কবিতা।

লাভ হইতে পারে কবির জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতাবলিতে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"রম্যাণি বীক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকটিতে প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যে নিগূঢ় সম্পর্কের ব্যঞ্জনা আছে রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে তাহা নাই। সেখানে ব্যক্তি-জীবনে প্রেমের অনুভূতি জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে প্রেমের পাত্রের সহিত মিলনের কল্পনায় মোহময়, আবেগ চঞ্চল—এই ভাবটির প্রকাশ রহিয়াছে। জন্মান্তরেও প্রেমের আলোকে পরস্পরকে চিনিতে পারা যায় এই ভাবটি সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইন্দুমতী অজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। পৌরবধূগণ বলিতেছেন,—

"রতিস্মরৌ নূনমিবাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথা হি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্॥ রঘু, ৭।১৫

রসিকজন বুঝিবেন পৌরবধূগণের উক্তিতে জন্মান্তরের বাসনার কথা এখানে বড়ো হইয়া ওঠে নাই, প্রেমের গভীরতা ও মৃত্যুঞ্জয়তার কল্পনাই শ্লোকটিকে সুন্দর করিয়াছে। তথাপি 'মনো হি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্' কথায় মানবচিত্তের জাতিস্মরতার তত্ত্ব লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় "সেই জন্ম পূর্বের স্মরণ"[১] "যুগান্তর-স্মৃতি"[২] দুইভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে,—প্রথমতঃ যেখানে একান্তই ব্যক্তিগত প্রেম দুইজনের জীবনসীমার মধ্যে বিধৃত হইয়া দেখা দিয়াছে—

১। সমুদ্রের প্রতি

২। ঐ

অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ,
—মানসী, পূর্বকালে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-জীবনের প্রেমকে রোম্যান্টিক কল্পনায় যুগ-যুগান্তরের নানা প্রথিত-প্রেমাপ্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়ের সহিত মিলিত করিয়া, তাহাতে নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ,—

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কথা
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমার মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
—মানসী, অনন্ত প্রেম।

এই উভয় শ্লোকের সমগ্র ভাবের প্রকাশ বলাকার ৪০ নং কবিতায় স্পষ্ট। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে মিলন জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতির রহস্যময় সঞ্চারকে প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবচিত্তে ঘনাইয়া আনে, ইহাই কবিতাটির মর্ম কথা।

"এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে-তোমার দৃষ্টি"

অনুসরণ করিবার ফলে যে-রহস্যময় অনুভূতি প্রেমিকার চিত্তে জাগিতেছে তাহা এই,—

"আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত জনতায়, কত একা।
সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক—ঝিকিমিকে।
কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।"

জন্ম জন্মান্তরের মিলনের সেই সুখস্মৃতি প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আজিকার মিলনকে গভীরতর আনন্দ ও দুঃখের মিলিত স্পর্শে অভিনব করিয়া তুলিয়াছে।

"তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কারি উঠিছে অহরহ
তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়,
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

"রম্যাণি বীক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকটির ব্যাখ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও আলোচনায় যে রম্য বিষাদের কথা বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা অপর একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাইয়া ব্যাখ্যাতীত বিচিত্র বিষাদে কবির অন্তর যখন উদাস, সুখ ও দুঃখের অনুভূতির মধ্যে ভেদরেখা যখন অবলুপ্তপ্রায়, তখন কোথাও ইহা শুধু (ক) স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি রোম্যান্টিক কবিসুলভ ভাব (mood) মাত্র, কোথাও বা ইহা (খ) এক বিচিত্র রহস্যময় আধ্যাত্মিক অনুভূতির সগোত্র অপর একটি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(ক) উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 'পুরস্কার' কবিতায় কবির উক্তিতে যাহা কেবলই সৌন্দর্যানুভূতি—

"শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে থাকি আমি মুগ্ধ নয়ানে,
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা
সুন্দর ধরাতল।”

মালিনীতে তাহাই (খ) অধ্যাত্মানুভূতির সগোত্র একটি পৃথক ভাব অথবা তাহার প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে।

“... ... .. দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গিরিশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধ ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—**আশ্চর্য পুলকে**
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হতে এনু আমি এই জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।”

মৈত্রী—করুণা—সেবার আদর্শ লইয়া যে-নবধর্ম মালিনীর অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছে তাহার মূলে প্রকৃতি হইতে সঞ্চারিত এই অনন্য-সাধারণ উপলব্ধি। এই যে—

“আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে”

এবং "কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে" এই অনুভূতি ও এই বিহ্বলতায় বক্ষ্যমাণ শ্লোকটিরই অনুরণন রহিয়াছে। মালিনীর এ উক্তিতে বিহ্বলতার ধ্বনিটিই প্রবল, আত্মজিজ্ঞাসার নয়। গীতাঞ্জলির কতগুলি কবিতার বিচারে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃততর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এইবার 'বলাকা' হইতে দুই একটি উদাহরণ সংকলন করিয়া আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব কী করিয়া অপর ভাবের সহিত 'জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞতা' ও 'পর্যুৎসুকত্বে'র মিশ্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য একাধিক ভাবের মিশ্র প্রকাশ যেখানে বিদ্যমান সেখানে একটির প্রাবল্য অপর ভাবকে গৌণ করিয়া তোলে, একটি যেখানে মূল উপজীব্য ভাব অপরটি সেখানে প্রসাধন-কল্পে সাধারণতঃ অবস্থান করে বলিয়া তাহা আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়ে সহজে ধরা পড়ে না।

মানুষের মন যে সমসাময়িক ও অনাগত কালের মানুষের মনের প্রতি আপনার রহস্যের পরিপূর্ণ বোধের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই ভাবটি বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ যাহা কিছু বলিয়াছে, যাহা কিছু ভাবিয়াছে, যাহা অনুভব করিয়াছে তাহা এই বিশ্বে একেবারেই হারাইয়া যায় নাই—প্রকৃতির আলোকে আকাশে বাতাসে তাহা সঞ্চরমাণ, অতীতের মানবচিত্তের সেই সব সুখ—দুঃখ—প্রেম—বেদনা—আশা—আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অনুভূতি এক মনোলোক হইতে অধুনা খণ্ডশঃ বিচ্ছিন্ন মানবসন্তানের চিত্তকে স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং প্রকৃতির দৃশ্যে গন্ধে গানে ভাবুক মানুষের স্পর্শকাতর সংবেদনশীল চিত্ত যখন কোন দুর্লভ মুহূর্তে আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির প্রভাব দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয় তখন অতীত যুগের তরুলতা গুল্মের সহিত একাত্মতার সঙ্গে, অতীত কালের মানবসম্প্রদায়ের সঙ্গেও একগোষ্ঠীভুক্ত হইবার অনুভূতি তাহাকে পাইয়া বসে।[১] রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'মেঘদূত'—'ঋতুসংহারে'র প্রভাবে প্রাণবন্ত 'কল্পনা'র 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় লিখিতেছেন,

১। (ক) প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ ও 'জীবনস্মৃতি'র ১৩৪৪ সং ১৬৯ পৃঃ দ্রঃ। "এখনো আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক জায়গায় যে শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে।" —জীবনস্মৃতি

(খ) 'বলাকা'র ১৬ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখিতেছেন,

'অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়—তীরে—তীরে।

আলোক তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র উর্ধ্ব শ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে।"

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।"

তখন এরূপ ব্যাখ্যা করিব না যে আজিকার এই বর্ষা প্রাচীন কালের বহু কবির কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। আজিকার এই বর্ষায় শতযুগের বিদেহ কবিদের বর্ষাসঙ্গীত যুগযুগান্তর পার হইয়া আজিকার কবির গানের সহিত মিলিত হইয়া বাজিতেছে, বর্ষা-ঋতুর আপনার রূপ ও সঙ্গীত যুগযুগান্তরের সহিত মানসসেতুবন্ধ রচনা করিয়াছে, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে।

"বলাকা" কাব্যে হংসবলাকার পক্ষবিধূননের ধ্বনিতরঙ্গ সুদূর অতীত কালের মানবসমাজের বাণীকে স্পর্শ করিয়াছে। সে বাণী আজিকার আকাশে এতদিন জাগরূক ছিল কিন্তু কবির জীবনে ঠিক এমন একটি ভাবের ঘোর লাগে নাই। নবীন সত্যের প্রকাশের জন্য চরাচর যখন স্তব্ধ হইয়া ছিল এমন সময়ে 'বিস্ময়ের জাগরণ' সৃষ্টি করিয়া হংসবলাকার পক্ষধ্বনি বাজিয়া উঠিল এবং চকিতে বিশ্বসংসারের অর্থ নূতন হইয়া ধরা দিল। মিথ্যার একটা যবনিকা চোখের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গেল এবং এতদিন যাহা কিছু জড় বলিয়া জানা গিয়াছে তাহার মধ্যে জীবনের ধর্ম চলিষ্ণুতা দেখা দিল। এই চলিষ্ণুতাকে, এই গতিবাদকে বলাকার মূল তত্ত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ পথে কবিতাটিতে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছে মূল কবিতাটির কিয়দংশের অনুসরণে তাহা ধরা পড়িবে।

"সহসা শুনিনু সেই-ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।"

এই ধ্বনিতরঙ্গ যে "বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া তুলিল আকাশে" তাহার ফলে

"মনে হল এপাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ!
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরু শ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

কিন্তু প্রকৃতিতে এই যে চলিষ্ণুতা তাহার সম্পর্কে অনুভূতির প্রকাশেই যে কবিতা শেষ হয় নাই ইহা লক্ষণীয়। পরবর্তী অংশে এই ভাবের দীর্ঘ অনুসরণ আছে, বিশ্বভুবন যে গতি-চঞ্চল এই কথাটি তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরবর্তী দুইটি পংক্তিতে কবি-হৃদয়ের একটি সংবাদ আছে,

"এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি।"

বেদনার এই অনুভূতি নিখিল-মানস-তীর্থের প্রতি চিরন্তন "অকারণ অবারণ চলা'র জন্য এবং অনাগত অনন্তকাল অসীম মানব-চিত্তলোকের প্রতি যাত্রায় অতীতকালের মানবচিত্তের সহযাত্রী হইবার রোমাণ্টিক কল্পনায় নিহিত ঃ—

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ-গানে
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

কালিদাসের অনুভূতিলোকে কবি পৌছিয়াছেন, "ওই শব্দরেখা ধরে"।

কালিদাসের শ্লোকটির প্রেরণাই এখানে ক্রিয়াশীল এমন কথা বলা চলে না। কবির রচনার প্রৌঢ় পরিণাম বলাকা কাব্যে সপ্রকাশ। অন্যতর বহু সাহিত্যস্রোত কবিচিত্তে এতদিনে আসিয়াছে ও অপগত হইয়াছে—তাহার কোনটি কিছু স্থায়ী সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছে, কোনটি বা রাখে নাই। অতএব শুধু এই কথা এখানে বলা চলে যে উক্ত কালিদাসীয় ভাবের সগোত্রতা এই কাব্যাংশে সূক্ষ্মভাবে বর্তমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যে-শ্রেণীর কাব্য-প্রভাবের আলোচনা করিয়াছি তাহা কবি-মানসের বিশেষ বিশেষ ভাবাবস্থানকে (mood) কেন্দ্র করিয়া। বর্তমান অধ্যায়ে জীবনের সহিত নিকটতর সম্পর্কে অন্বিত যে-সকল তত্ত্ব কালিদাসের কাব্যে অবলম্বিত ও রবীন্দ্রকাব্যে অনুসৃত হইয়াছে তাহা আলোচিত হইতেছে। এতদুভয়ই ভাব হইতে ভাবের প্রেরণার অংশীভূত।

কুমারসম্ভব কাব্য হইতে যদি কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিতেই হয়[১] তবে তাহা নিম্নোক্ত তিনটি সূত্রে করিতে হইবে :—

(ক) তপস্যাদ্বারা রূপজ প্রেমের গ্লানির সংস্কার

(খ) ভক্ত ও ভগবানের প্রেমসম্পর্ক ও ভক্তের কুটিরে ভগবানের ছোট হইয়া, ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া প্রেম-ভিক্ষার্থী হইয়া আবির্ভাব

(গ) আত্মকেন্দ্রিক বিশ্ববর্জিত বন্ধ্যাসাধনার সহিত প্রেমের সংযোগে বিশ্বকল্যাণের (দৈত্যপীড়িত স্বর্গের উদ্ধারকর্তা কুমারের) জন্ম

রবীন্দ্রকাব্যে এই তিনটি ব্যাপারই সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

তপস্যা দ্বারা রূপজ প্রেমের গ্লানির সংস্কার

এই নীতির দিক হইতে বিচার করিলে "কুমারসম্ভব" এবং "শকুন্তলার" কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায়

১। 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'Religion of the forest' প্রবন্ধ দ্রঃ।

সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি-প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে—স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়,—যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে,—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্র-কন্যা-অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।

ভোগসর্বস্ব রূপজ প্রেম[১] কুমারসম্ভবে মহাদেবের তৃতীয় নয়ন-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, শকুন্তলায় ঋষি-শাপবিদ্ধ হইয়া বিরহতাপে বিশীর্ণ হইয়াছে, মেঘদূতে প্রভুশাপগ্রস্ত হইয়া একই পরিণাম ভোগ করিয়াছে। বিক্রমোর্বশীয় নাটকেও সংসারের প্রতি কর্তব্যবিমুখ ভোগসর্বস্বতা শাপগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছেদক্লিষ্ট হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ভোগলোলুপতার লাঞ্ছনা মৃদু,[২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই নাটকেও কালিদাসের ভোগবিমুখতা দেখিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে

১। সাধারণতঃ সংস্কৃতকাব্যে 'দেহমুখ্য' ও 'দেহাতীত' বলিয়া প্রেমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই। বৈষ্ণবেরাই এই ভেদ প্রথমে নিরূপিত করেন। [Treatment of love in Sanskrit Literature—Dr. S. K. De দ্রঃ] তবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে সৌন্দর্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রেমকে স্পষ্টতঃ বড়ো করিয়া দেখানো হইয়াছে। ৪২—৪৩ পৃষ্ঠায় কুমারসম্ভব হইতে উদ্ধৃতি দ্রঃ। রবীন্দ্রকাব্যে 'কড়ি ও কোমলে'র পর হইতে এই ভেদ প্রবল হইয়াছে। ফলে অনুভূতি বহুস্থলে গাঢ়তা ও তীব্রতা হারাইয়াছে।

২। প্রকৃতপক্ষে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীয় নাটকে রূপজ প্রেমের গ্লানির পরিশোধন তপস্যাদ্বারা হয় নাই, যেমন শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে হইযাছে।

—History of Sanskrit Literature Vol. I.
—De and Das Gupta P. XXXVI—XXXVII

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে **রবীন্দ্রনাথ কী অর্থে কালিদাসের রচনাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতি অধিকতর প্রণিহিত** হওয়া **প্রয়ো**জন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও প্রেমের কল্যাণময় প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের নিকট বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। এই নাটক সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "It must never be thought that, in this play the poet's deliberate object was to pander to his royal patron by inviting him to a literary orgy of lust and passion. The very introductory verse indicates the object towards which this play is directed. The poet begins the drama with the prayer 'Sanmārgālokayan Vyapanayatu Sa nastamasi Vritimiśaḥ" (Let God illumine for us the path of truth, sweep away our passions, bred of darkness). This is the God Shiva, in whose nature Parvati, the eternal woman, is ever commingled in an ascetic purity of love. The unified being of Shiva and Parvati is the perfect symbol of the eternal in the wedded love of man and woman. When the poet opens his drama with an invocation of this spirit of the Divine Union it is evident that it contians in it the message with which he greets his Kingly audience". —*The Religion of the forest.*

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে সকলে একমত হইবেন ইহা কোন ক্রমেই আশা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিকতাসন্ধিৎসু

চিত্ত এই গ্রন্থখানিতে যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব দেখিয়াছে তাহার প্রকৃতি কিরূপ দেখা যাক।

"The whole drama goes to show the ugliness of the treachery and cruelty inherent in unchecked self-indulgence. In the play the conflict of ideals is between the King and the Queen, between Agnimitra and Dharini, and the significance of the contrast lies hidden in the very names of the hero and the heroine. Though the name Agnimitra is historical yet it symbolises in the poet's mind the destructive force of uncontrolled desire—just as did the name Agnivarna in Raghuvamsha,—Agnimitra, "the friend of fire," the reckless person, who in his love-making is playing with fire, not knowing that all the time it is scorching him black. And what a great name is Dharini, signifying the fortitude and forbearance that comes from majesty of Soul! What an association it carries of the infinite dignity of love, purified by a self-abnegation that rises far above all insult and baseness of betrayal!" (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

মালবিকাগ্নিমিত্র সম্পর্কে কবির এই দীর্ঘ উক্তির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির কারণ এই যে ইহাতে কালিদাসীয় কাব্যের সাঙ্কেতিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিনিবেশ এবং যাহা কিছু প্রতীকী ও সাঙ্কেতিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার প্রতি তাঁহার চিত্তে

ঐকান্তিক উন্মুখতা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রচনায় সাঙ্কেতিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে এই উদ্ধৃতির সহায়তা গ্রহণ করিব।

বস্তুতঃ যদিও কালিদাস হংসপদিকার গান ব্যতীত তাঁহার কাব্য-নাটকে সাঙ্কেতিকতা কোথাও স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তথাপি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দুষ্মন্তের অনুসৃত মৃগ শকুন্তলার প্রতীক, কণ্বতপোবনে 'মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ' গজ দুষ্মন্তেরই প্রতিরূপ, দুর্বাসার ও যক্ষপতির শাপ এবং শিবের তৃতীয়-নয়ন-বহ্নি সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের এই সাঙ্কেতিকতা-সন্ধানী দৃষ্টিতেই কুমারসম্ভব কাব্যে শিব-পার্বতীর মিলনের উক্ত তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব ধরা পড়িয়াছে।

কুমারসম্ভব কাব্যে উমা-মহেশ্বরের মিলন কুমার কার্তিকেয়ের জন্মের পবিত্র দায়িত্ব স্বীকার করিয়া। দৈত্যপীড়িত স্বর্গের উদ্ধার যিনি সাধন করিবেন রূপমুগ্ধতার মধ্যে তাঁহার জন্ম সম্ভবপর নয়, দেহবিকারের ঊর্ধ্বে তাহার সূচনা হওয়া আবশ্যক, তাই উমাকে কবি তপস্যাদ্বারা, প্রায়শ্চিত্তদ্বারা গ্লানিমুক্ত করিয়াছেন। কুমারসম্ভবে স্পষ্ট করিয়াই কবি বলিয়াছেন, মদনভস্মের পরে পার্বতী—

"ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ॥" ৩।৭৫

[নিজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহ, বিশেষ করিয়া সখী দুইজনের সমক্ষে, ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাঢ়তর লজ্জায় মুখ নত করিয়া কোনক্রমে গৃহাভিমুখে চলিলেন।]

তারপরে "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী" ৫।১ [সমস্ত হৃদয় দিয়া রূপকে তিনি নিন্দা করিলেন।] এবং "ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং

সমধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ”। [একাগ্রতার সহিত তপস্যা অবলম্বন পূর্বক নিজের বিফল সৌন্দর্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।] কারণ “অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ॥” ৫।২ [অন্যথা তেমন প্রেম এবং তেমন স্বামী আর কেমন করিয়া লাভ করা যায়।]

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়ে।[১] ভরতের ন্যায় রাজচক্রবর্তীর জন্মের জন্য এই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। বিক্রমোর্বশীয়ের তত্ত্বার্থ এই যে রাজকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া বিলাসমত্ত ও কামান্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বিক্রম লতারূপিণী উর্বশীকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, দেবী-শাপগ্রস্তা উর্বশীর দেহবিকারও এই মত্ততার অংশভাগিনী হইবার ফল।

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে রাজমাতা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, ‘আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাসের পারণা, সেইদিন দীর্ঘজীবী তুমি আসিয়া অবশ্যই আমার আনন্দ-বর্ধন করিবে’। রাজা রাজমাতার নিকটে বিদূষককে নিজ প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন এবং “হতস্তপস্বিকার্যম্” বলিয়া আশ্রমে থাকিয়া গেলেন। কর্তব্যের এই যে অবহেলা প্রেমমূঢ় দুষ্মন্তের আচরণে দেখা গেল, ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্মন্তের চরিত্রে তাহার চিহ্নও নাই; অনুশোচনার তপস্যা দ্বারা সোনার খাদ দূর হইয়াছে ও বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্লিষ্ট হইলেও রাজধর্মের পবিত্র দায়িত্ব পালনে তিনি পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন এবং ইন্দ্রের ডাকে অসুরদমনে স্বর্গযাত্রা করিয়াছেন।

১। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। History of Sanskrit Literature Vol. I. (De and Das Gupta) ভূমিকাংশ দ্রঃ।

দেহাশ্রয়ী রূপজ প্রেমকে বহুস্থলে রবীন্দ্রনাথ কাব্যমধ্যে অঙ্কন করিয়াছেন এবং ভোগের বিকার হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য কর্তব্যের আহ্বান ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং মোহমুক্তির মধ্যে, বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের মধ্যে ভোগ-কলুষতার নির্বাণ ঘটিয়াছে। "কড়ি ও কোমল" কাব্যে ইহা ভাব মাত্র এবং "রাজা ও রাণীতে" ইহাতেই রূপের আরোপ ঘটিয়াছে। "কড়ি ও কোমলে" ভোগ হইতে ভোগবিরাগের প্রতি উন্মুখতা, 'রাজা ও রাণীতে' ভোগৈকরসতা হইতে কর্মের মধ্যে মুক্তি, পুরুষকারের সহিত, কর্মের সহিত প্রেমের মিলনে প্রেমের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন,
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।"

—দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল

এই উগ্র ভোগবাসনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লান্তির সূচনা,

"এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়।"

তাহার পরেই কবিচিত্তে কল্যাণময় প্রেমের স্ফুটতর বোধ জাগিয়াছে ঃ—

"এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোল না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি,
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।"

"মরীচিকা" কবিতায় মোহমুক্তি পূর্ণতালাভ করিযাছে।

"এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুম শয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ কুসুম বনে স্বপন চয়ন।
দেখো, ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা নির্মল অনলে।
চলো গিয়ে, থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখে দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসিকান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥"

যাহাকে কবি "দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা" বলিতেছেন, মেঘদূত" কাব্যে তাহাই প্রভুশাপরূপে ভোগৈকরসস্বর্গ অলকাপুরী হইতে যক্ষকে নির্বাসিত করিয়াছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুর্বাসার অভিশাপরূপে চপল তপ্ত প্রেমের গ্লানিকে দগ্ধ করিয়াছে, বিক্রমোর্বশীয় নাটকে রাজধর্মপালনের পবিত্র কর্তব্য হইতে পলায়নপর ও বিদ্যাধর কন্যার দর্শন মাত্রে আত্মবিস্মৃত রাজাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীকে দণ্ডিত করিয়াছে।

ভোগৈকরসতা হইতে মোহমুক্তির পথে জীবনকে উত্তীর্ণ করিবার এই আদর্শ 'রাজা ও রাণী'তে বিক্রম-সুমিত্রার প্রেম ও

তাহার সমান্তরালসূত্রে প্রবহমাণ কুমারসেন ও ইলার প্রেমের মধ্যে অনুসৃত হইয়াছে। প্রেমমূঢ় যে-বিক্রম বলিয়াছিলেন,

> "নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে,
> জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
> তোমার চরণ তলে ধূলির মাঝারে।"

—১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য।

তাঁহাকে নিষ্ঠুর লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য সুমিত্রা রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন। নিজেকে নূতন করিয়া বিক্রম আবিষ্কার করিয়াছেন, যদিচ তাঁহাকে প্রবল মোহের অপর দিক মূঢ় নিষ্ঠুরতা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিক্রমদেব বলিয়াছেন,—

> "এ কী মুক্তি। এ কী পরিত্রাণ। কী আনন্দ
> হৃদয় মাঝারে। অবলার ক্ষীণ বাহু
> কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
> বাঁধিয়া বিবরমাঝে।·········
> মুক্তি! মুক্তি আজি। শৃঙ্খল বন্দীরে
> ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এত দিন
> এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
> কীর্তি, কত রঙ্গ, কত কী চলিতেছিল
> কর্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে
> পড়ে; রুদ্ধদল চম্পককোরক মাঝে
> সুপ্ত কীটসম। কোথা ছিল লোকলাজ!
> কোথা ছিল বীর পরাক্রম!"

অপরদিকে ইলার প্রতি কুমারসেনের প্রেম জীবনে আশা-আনন্দ, বীর্য-পুরুষকার, কল্যাণ-রাজধর্মের উৎস। কুমারসেনের উক্তি—

"পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্তি করিয়া অর্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মতো।"

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে বিক্রম ও কুমারসেনের চরিত্রের মিলিতপ্রকাশ অর্জুন। সরোবর-সোপানে বসন্ত ও মদনের দাক্ষিণ্যে বর্ষভোগ্য অপরিমেয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া অর্জুনের ব্রহ্মচর্য ও বীরত্বাভিমান দূর হইয়াছে।

"..............খ্যাতি মিথ্যা
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোর
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।"

ক্রমে ভোগের অনুগ ক্লান্তি ও সহজ ক্ষাত্রধর্ম অর্জুনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। দস্যুদলের অত্যাচারের আশঙ্কায় ভীত জনপদবাসিগণের ভয় মোচনে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত অর্জুনকে চিত্রাঙ্গদা বাধা দিতেছে। অর্জুন বলিতেছেন,

"..............বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।

সুমধ্যমে ক্ষীণ কীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি 'আনি'
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখি গা
দিব। হবে তব যোগ্য উপাধান।"

ভোগের ললিত শয়ন তাঁহার ক্রমে অসহ বোধ হইতেছে। তিনি বলিতেছেন,

"অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘ-শীত-সুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এসো এসো দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ-সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্প-গন্ধ মদিরায় নিদ্রাঘন ঘোর
অরণ্যের অন্ধ গর্ভ হতে।"

চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের আত্মবিস্মরণ ও এই সুযোগে দস্যুদলের হানা দিবার বিবরণ এবং পুনরায় প্রবুদ্ধ অর্জুনের দস্যুবিজয়ে যাত্রা—ইহার সহিত কুমারসম্ভবের রবীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যার বিশেষ ভাবগত সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"In the commencement of the poem we find that God Siva, the Good, [শিব শব্দটিও এখানে রবীন্দ্রনাথের নিকট সাঙ্কেতিক অর্থে পূর্ণ] had remained for long lost in the self-centred solitude of ascetism, detached from the world of reality. And then Paradise was lost. But Kumarasambhava

is the poem of Paradise regained. How was it regained? When Sati, the Spirit of Reality, through humiliation, suffering and penance, won the Heart of Shiva, the spirit of Goodness. And thus, from the union of freedom of the real with the restraint of the Good, was born the heroism that released Paradise from the demon of Lawlessness."

—*The Religion of the Forest.*

অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিরহখিন্ন, কর্তব্যবোধে পুনরুদ্বুদ্ধ দুষ্মন্তের অসুরযুদ্ধে স্বর্গযাত্রার মধ্যে জীবনবিধায়ী কল্যাণময় প্রেমের যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে তাহাই যে চিত্রাঙ্গদা কাব্যে ভোগবিতৃষ্ণ অর্জুন চরিত্রে এবং বিকারমোহ হইতে সদ্যসমুত্থিত বিক্রম চরিত্রে নূতন শক্তি ও পুরুষকারের উদ্বোধনের মধ্যে প্রকাশমান তাহা সবিশেষ লক্ষণীয়।

পরিশেষে চিত্রাঙ্গদা কাব্যে প্রেমের যে আদর্শ চিত্রাঙ্গদার শেষ উক্তিতে প্রকাশমান তাহাতে নারী যে ভোগের সামগ্রী মাত্র নয়, পুরুষের অলস কল্পনার দেবীও নয়, জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অংশী ইহাই বলা হইয়াছে। একথার অর্থ এই, প্রেম জীবনের অবসরক্ষণের বিলাস মাত্র নয়, ইহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শক্তির, প্রেরণার, কল্যাণের উৎস।

"..................যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে—
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।”

রূপজ প্রেমের বিকার হইতে নারীকে মুক্ত করিয়া দেখিবার এই প্রয়াস এবং জীবনে কল্যাণ-বিধায়িনী শক্তিরূপে তাহার বলিষ্ঠ-সুন্দর কল্পনা এখানে কাব্যময় প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

রঘুবংশের অষ্টম সর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের বিলাপে অজের মুখে “পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে” কথাটি বসাইতে ভুল করেন নাই; করিলে তাহা সত্য হইত না, চরিত্রানুগ হইত না, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক অস্বীকার করা হইত। কিন্তু ইহাই সব কথা নয়; আজ বলিতেছেন,

“ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণ-প্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥”—রঘু ৮।৬৬

ইন্দুমতী অজের শুধু শয্যাসঙ্গিনী নন, বিলাস সজ্জার তিনি লক্ষ্য মাত্র নন, তিনি জীবনের আনন্দ, জীবনের সঙ্গীত; ঋতু উৎসবময় হইয়া ওঠে তাঁহার সাহচর্যে এবং সর্বোপরি, তিনি আত্মবিস্মরণ, মোহ, বিহ্বলতার সৃষ্টি করেন না—তিনি মূর্তিমতী ধীরতা।

অজ যে দৃষ্টিতে ইন্দুমতীকে সারা জীবন দেখিয়াছেন তাহাতে নারীর যে মহিমময়ী, সৌন্দর্যময়ী, সর্বার্থময়ী প্রতিমাখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর কিছু যোগ দিবার নাই। অজ বলিতেছেন,

‘গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাংবদ কিং ন মে হৃতম্॥”

'মহুয়া' কাব্যের কতগুলি প্রেমের কবিতার মধ্যেও আমরা চিত্রাঙ্গদার এই বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ দেখিতে পাই। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রেমের 'সাধনবেগ' বলিয়াছেন তাহা ভোগের ও মোহের আবর্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এক বিপুল শক্তিরূপে প্রেমের প্রকাশ। এই শক্তি মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে অনুকূল, অথবা বলা যাইতে পারে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা এই শক্তির অপেক্ষা করে। ভাবের বৈশিষ্ট্য এই পর্বের প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রকাশমান। প্রকাশভঙ্গীতেও নূতনত্ব আছে। ভাবের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম প্রণয়ের সলাজ অর্ধপ্রকাশ এখানে দুর্লভ, ভাষাও তেমনি অর্ধাভিব্যক্তির বঙ্কিম-সুন্দর সলীল পন্থা পরিহার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। মহুয়ায় কিশোর-কিশোরীর প্রেম নাই, পরিণত জীবনের প্রেমই সেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে।

'মহুয়া'র প্রথম কবিতা 'উজ্জীবনে' এই শ্রেণীর কবিতার মূলসুর বাজিয়াছে। কুমারসম্ভবে দেবগণের অনুরোধে কামজিৎ মহেশ্বর ভস্মীভূত কামের উজ্জীবন ঘটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে উজ্জীবন পবিত্র, সুন্দর, শক্তিমান্।

> "ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু—
> রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
> যাহা মরণীয় যাক মরে,
> জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
> যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
> যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
> মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,—

মহাদেব যখন মদনকে উজ্জীবিত করিয়াছেন তখনও, পরিপূর্ণ ভোগের মধ্যেও, তিনি মহাদেব। বিক্রম যেমন রাজকার্যে ও দুষ্মন্ত যেমন রাজমাতার আহ্বানে উদাসীন ও কর্তব্যবিমুখ, যক্ষ যেমন ভোগ-সর্বস্ব, মহাদেব তেমন নন। অষ্টম সর্গের সম্ভোগবর্ণনার কালে কালিদাসের মহাদেব সন্ধ্যা-উপাসনার লগ্ন বহিয়া যাইতে দেন নাই।

যেমন আলোচ্য কবিতার কল্পনায় ও ভাবে, তেমনি 'মহুয়া'র অপর কতগুলি কবিতায় কালিদাসীয় প্রভাব মুদ্রিত আছে।

'অপরাজিত' কবিতাটি পুরুষের উক্তি। কুমারসম্ভবে প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়াছিল নারী, এখানে করিয়াছে পুরুষ, কিন্তু প্রেমে সাফল্যের জন্য যে-পথ সে বাছিয়া নিয়াছে তাহা দুশ্চর সাধনার পথ। অতি সূক্ষ্ম অথচ সুনির্দিষ্ট ভাবে এই কবিতাটিতে কুমারসম্ভবের কতিপয় শ্লোকের প্রভাব ক্রিয়াশীল।

"বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ;
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায়রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি ॥

কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন ;”

পার্বতী সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে-পর্যন্ত সে-তপস্যা ‘দারুণ উপবাসে’ একান্ত দুশ্চর না হইয়াছে সে-পর্যন্ত মহাদেব আসিয়া দেখা দেন নাই। তাঁহার সাধনা সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে,

কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন।”

উদ্ধৃত পংক্তি নিচয় রচনার সময়ে কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের ২৮, ২৯ ও ৩০ সংখ্যক শ্লোকত্রয় যে কবির স্মরণে ছিল নিম্নে তাহাদের উদ্ধৃতি হইতে তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। শিব কখন আসিলেন? পার্বতী কঠিন তপস্যায় রত ছিলেন বটে, কিন্তু যখন বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-বিশীর্ণ যে পত্র, তাহার ভোজনও তিনি পরিত্যাগ করিয়া ‘দারুণ উপবাসে’ তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন তখন ‘অজিনাষাঢ়ধরঃ’ মহেশ্বর অকস্মাৎ দেখা দিলেন।

“স্বয়ং-বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরাহি কাষ্ঠাস্তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥”—কুমার ৫।২৮

[বৃক্ষ, হইতে স্বয়ংস্খলিত পত্রের রস পান করিয়া থাকাই

কঠিনতম সাধনা। তপঃকালে তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রিয়ভাষিণী তাঁহাকে পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ অপর্ণা বলিতেন।]

"দারুণ উপবাসে" "কঠিনতর যবে সে পণ" তাহার বিশদতর বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে।

"মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভি-
র্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহনিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জিতং
তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥"

(মৃণাল-কোমল দেহলতা এই প্রকার অহোরাত্র তপশ্চরণ দ্বারা কৃশ করিয়া তিনি কঠিন শরীর দ্বারা অর্জিত তপস্বিগণের তপস্যাকেও পরাজিত করিলেন।)

পরের শ্লোকেই শিবের প্রবেশের বর্ণনা। এই শ্লোকে ব্রহ্মচারিবেশী শিবের একটি বিশেষণ "অজিনাষাঢ়ধরঃ" অর্থাৎ কৃষ্ণসারচর্ম ও পলাশদণ্ড যিনি ধারণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচ্য অংশের ভাষায় "আষাঢ় মাসে" কথাটি ভিন্নার্থক হইলেও 'কুমারে'র "অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্" ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠকের মনে সঙ্গে সঙ্গে জাগা স্বাভাবিক।

'মহুয়া'র 'পরিচয়' কবিতায় প্রেমের আদর্শ রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। দেহ-লোলুপতার ঊর্ধ্বে তাহার স্থান। যখন "গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত" তখন স্পর্শলোলুপতার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে,

"ঝঙ্কারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সঙ্গীতে।

চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।”

এ প্রেমের স্বরূপ এই,—

“সহজ-সাধনলব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,—
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।”

কালিদাসের ভাষায় পার্বতীর দুশ্চরসাধন-লব্ধ মহেশ্বরের স্বরূপও ইহাই :—

“অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃস সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে·········”

[বাহিরে নিঃস্ব হইলেও তিনি সর্ব ঐশ্বর্যের উৎস, শ্মশানচারী হইলেও তিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, বাহিরে তিনি ভীষণ হইলেও তাঁহাকে কল্যাণময় বলা হয়।]

এতক্ষণে কবিতার আরম্ভে অপরাহ্নের আকাশে রৌদ্রদীপ্ত পিঙ্গল মেঘরাজির সঞ্চয় ও ঝটিকা-প্রবাহের বর্ণনায় যে উৎপ্রেক্ষাটির প্রয়োগ হইয়াছিল তাহার অর্থ বিশদ হইল ;

“শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায়।”

রূপমূঢ়তা ও ভোগ-বাসনাকে ধিক্কৃত করিয়া উৎপ্রেক্ষাটি গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জনায় এক নূতন সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কবিতার উপজীব্য-ভাবকে সমৃদ্ধ করিয়া ও পাঠকচিত্তে অভিজ্ঞানশকুন্তলের দুর্বাসার শাপকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে জাগরূক করিয়া উৎপ্রেক্ষাটি এই সার্থকতা অর্জন করিয়াছে।

(খ) এবার আমরা কুমারসম্ভব কাব্যে মহাদেবের তপস্যা ও উমামহেশ্বরের মিলন-কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ যে মানবীয়তার (Humanism) প্রকাশ দেখিয়াছেন এবং রবীন্দ্রকাব্যে তাহার যে অভিনব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাহার আলোচনা করিব। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের বিষয়ে সর্বদা ঐকমত্য হইবেই তাহা নহে, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব বিচারে কালিদাসীয় কাব্যের রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত অর্থই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিবের তপস্যা পূর্ণতার গৌরবের জন্য গৌরীর অনাবিল সৌন্দর্যের সহিত মিলনের অপেক্ষা করে। কালিদাসের কাব্যে দেবদম্পতীর বিবাহপূর্ব প্রণয়ের কাহিনী যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পার্থিব সীমার অতিশায়ী তাঁহাদের দেবোচিত চরিত্রের অধৃষ্য মাহাত্ম্য অপেক্ষা মানবোচিত দিকটাই সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। "The magnificent figure of the divine ascetic, scorning love but ultimately yielding to its humanising influence,··· ··· ··· ··· not in his ascetic pride but in playful benignity,—this poetic but neither moralistic not euhemeristic working up of a scanty pauranic myth in a finished form"[১]—ইহাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'উৎসর্গ' কাব্যের ২৬ সংখ্যক কবিতায় নিম্নোক্তরূপ :—

১। History of Sanskrit Literature (P. 128)
Dr. S. N. Das Gupta and Dr. S. K. De

".. ... ... ভব-ভবানীর প্রেমগাথা।
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে। কিছু নাহি চাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার—
পরিলেন পরিণয়পাশ। এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল তোমার যত শিলা।"

দেবাদিদেবের "এই যে প্রেমের লীলা", রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির বহু কবিতার ইহা প্রেরণার উৎস। যাহা আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবীয় ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয় এমন অনেক কবিতায় প্রকৃতপক্ষে কবির প্রেরণার মূলে কালিদাসীয় কাব্যের এই ভাবটি কাজ করিয়াছে। এইখানে টমসনের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার Rabindranath Tagore—His life and work গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন, "Rabindranath's real master has been Kalidasa,······Frequently, when the strain is ostensibly a Vaisnaba one, and the theme is Krishna and Radha, the real mood is not Vaisnaba at all, but, as obviously as possible, is Kalidasa's·········" বলা বাহুল্য, টমসন যাহা বলিয়াছেন, সূত্রাকারে বলিয়াছেন; কোন্ বিশেষ কবিতাগুলি তাঁহার লক্ষ্য, অথবা তিনি এই সিদ্ধান্তে কী করিয়া পৌঁছিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি নীরব।

যাহা হউক, গীতাঞ্জলির যে সকল কবিতা বৈষ্ণবভাবদ্বারা অনুপ্রেরিত বলিয়া সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে সেখানে আমরা মূলতঃ কুমারসম্ভবের প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি বলিয়া উহাতে

বৈষ্ণব পদাবলীর কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সুফী কবিগণের ভাব এবং মীরাবাঈ, দাদূ, কবীর ও বাউলদের সাধনার বৈশিষ্ট্য আপন আপন সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের রচনায় কোথাও কুমারসম্ভবের এই বিশিষ্ট প্রেম-সাধনার মনোরম পূর্ণাঙ্গ চিত্রখানি নাই। দেবতাকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া কল্পনা কালিদাস ব্যতীত অপরাপর এই সকল সাধক ও কবির জীবনে ও কাব্যে রহিয়াছে। কিন্তু প্রেমিকার জন্য পরমেশ্বরের ছোট হইয়া, সাধারণ মানুষ হইয়া ধরা দিবার কল্পনা—শুধু রেখাচিত্রে নয়, বহুবর্ণাঢ্য পূর্ণাঙ্গ চিত্রে—কালিদাসের কুমারসম্ভব ব্যতীত আর কোথায় আছে? বহু পরবর্তী মধ্যযুগীয় কাব্যের 'বিলাস-কলা'-পারঙ্গম দেবতার 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্'—এর কথা এখানে আসে না। "…………the eternal wedding of love, its wooing and sacrifice and its fulfilment, for which the Gods wait in suspense"——এমন কাহিনীতে কামজিৎ দেবতার মুখে "অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ"—এমন কথা আর কোন্ কাব্যে আছে? আর কোন্ কাব্যে এমন কল্পনা আছে যে যিনি "বিভুঃ,"—জিতেন্দ্রিয় সর্বশক্তি সর্বঐশ্বর্যের অধীশ্বর, তিনি প্রণয়িনীর সহিত মিলনের জন্য আগ্রহে উৎকণ্ঠায় দিন যেন আর অতিবাহিত করিতে পারিতেছেন না? ঋষিরা বলিয়াছেন বিবাহের উপযুক্ত শুভদিন আসিতে তিনটি দিন বাকি, কিন্তু

> "পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রা-
> দগময়দদ্রিসুতা-সমাগমোৎকঃ।"—কুমার ৬।৯৫

[পার্বতীর সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠ পশুপতিও কোনমতে কষ্টে এই দিন কয়টি কাটাইলেন।] ঈশ্বরে এই মানবোচিত ধর্মের

আরোপই কুমারসম্ভবের কাব্যময়তার একটি বিশেষ লক্ষণ। "মনোনবদ্বারনিরুদ্ধবৃত্তি" এই সন্ন্যাসীকে প্রেমের হাতে ধরা দিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ আনন্দলাভ করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যে এই আনন্দই কবিকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। "প্রকৃতির পরিশোধে" ইহার সূচনা হইয়াছিল।

এই আনন্দের আর একটি কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি, আবার রবীন্দ্রনাথ সমাজ-জীবনে ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম গৃহীর ধর্ম, সন্ন্যাস ব্রাহ্মধর্মে স্বীকৃত হয় নাই।[১] সংসারাশ্রম রবীন্দ্রনাথের কাছে একমাত্র সত্য এবং ইহাকে পরিহার করিয়া যে ধর্মচর্যা তাহা কবির জন্য নহে। "তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো"—তাঁহার বিবিধ কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার প্রার্থনা—

"সংসার তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।"

এবং কবির বিশ্বাস, এই সংসারজীবন ও অধ্যাত্মজীবন—এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর ; তাই—

"করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।"

কালিদাসের নিকট সংসারাশ্রম "সর্বোপকার-ক্ষমমাশ্রমম্" রঘু ৫।১০, রবীন্দ্রনাথের নিকটও তাহাই সত্য। নৈবেদ্যের বিখ্যাত 'মুক্তি' কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের এই সত্যেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে ;—

১। তুলনীয় :—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

"..................ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

শিবের তপস্যাকে তিনি "self-centred solitude of his ascetism" আখ্যা দিয়াছেন, এই তপস্যার সার্থকতা দেখিয়াছেন তিনি—

"কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে"

সেই ব্যাপারে। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায় তিনি বলিতেছেন,—

"হে শুষ্কবল্কলধারী, বৈরাগি ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারেবারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।"

ভৈরবের যে নূতন বরবেশ,—

" .....শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবী বল্লরীমূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু,—চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।"

তাহাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। "সুন্দরের জয়ধ্বনি গান"ই কবির ব্রত, মোক্ষসাধনা নয়। উমা-মিলনার্থী এই শিবেরই রবীন্দ্রকাব্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা। যে শিব দুশ্চর তপস্যার আসনে "অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহে"র ন্যায় আসীন তিনি নহেন, "যবে বিবাহে

চলিলা বিলোচন," যখন প্রগল্‌ভবাক্‌ রসিক ছদ্মবেশী যুবা উমার সহিত কৌতুকালাপে রত, তখন সেই মানবমূর্তি প্রেমিক দেবতাই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

অবশ্য কালিদাস তাঁহার মহাদেবকে এইভাবে কল্পনা করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমাদের মন্ত ভেদ হইতে পারে কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না, রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে কুমারসম্ভবের যোগী মহেশ্বরকে দেখিয়াছেন তাহার কথাই আমরা বলিতেছি।

কবি যখন বলিতেছেন,—

"দয়া করে ইচ্ছে করে আপনি ছোট হয়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।"

তখন মধুর-মূর্তি নয়নরঞ্জন দেবতার শুধু করুণারই প্রকাশ কবির উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেমের সাধনার পূর্ণ গৌরবকে কবি প্রকাশ করিতেছেন নিম্নোক্ত কবিতায়,—

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেল।
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হিয়া লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে—
প্রভু নিত্য আছ জাগি।”

এ কবিতার ভাব কুমারসম্ভবের “বিশ্বমূর্তি” ‘ত্রিলোকনাথ’ ‘জগচ্ছরণ্য’ মহেশ্বরের শিরীষ-কুসুম পেলবা গৌরীর কুটীরদ্বারে প্রেমভিক্ষারই প্রতিরূপ।

নিম্নোক্ত কবিতাটিতে ও একই ভাবের প্রকাশ ঃ—

“তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা বসে আপন মনে
গাইতেছিলাম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে॥”

বলাকার ২৯ সংখ্যক কবিতাটিতে এই ভাবেরই ছায়াপাত হইয়াছে। “ভব-পূর্ব-পত্নী সতী”কে (কুমার ১।২১) নব ‘কলেবরে

পার্বতীরূপে, নূতন করিয়া 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' পার্বতীকে নূতন করিয়া "বালারুণবভ্রুবল্কলা" তাপসীরূপে পাইতে মহেশ্বরের যে আনন্দ ও ব্যাকুলতা এ কবিতায় তাহার প্রেরণা থাকিতে পারে।

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে,
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।
আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।"

যিনি একদা স্ত্রীলোকের সন্নিধি তপস্যার বিঘ্ন জ্ঞান করিয়া স্থান

ত্যাগ করিয়াছিলেন[১], তিনিই বিবাহের পূর্বের তিন দিন প্রবল উৎকণ্ঠায় যেন আর কাটাইতে পারিতেছেন না, তিনিই অষ্টম সর্গে সন্ধ্যাবন্দনায় কিছু সময় একান্তই ব্যয় করিতে হইয়াছে বলিয়া গৌরীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছেন[২]। কুমারসম্ভবে শঙ্করের এই মানবিকতা রবীন্দ্রনাথকে কাব্যপ্রেরণা জোগাইয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই শ্রেণীর কবিতার সহিত বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনা ও পদাবলী সাহিত্যের যোগ নিতান্তই বহিরঙ্গ ও ক্ষীণ। এইবার বৈষ্ণবীয় সাধনরীতির সহিত ইহাদের ভাবের প্রভেদ কোথায় তাহা নির্দেশ করা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম অখিলরসামৃতমূর্তি, তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার, গোলোকে তাঁহার অধিষ্ঠান। শ্রীরাধা জীবাত্মা, মহাভাবস্বরূপিনী তিনি, এতদুভয়ের মিলন বৈষ্ণবের পরমতত্ত্ব এবং তাহাই লৌকিক ভাষায়, লৌকিক রসের আশ্রয়ে প্রাকৃতজনের বোধগম্য করিয়া পদাবলী-সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। মধুরে সকল রসের সমন্বিত প্রকাশ বলিয়া সেখানে বহির্লক্ষণ হিসাবে লৌকিক প্রেমকে অবলম্বন স্বরূপ

১। "তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রীসন্নিকর্ষং পরিহর্তুমিচ্ছন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ॥

—কুমার ৩।৭৪

[তপস্বী প্রমথনাথ, বজ্র যেমন বনস্পতিকে ভগ্ন করিয়া অদৃশ্য হয় সেই প্রকার কামকে ভস্মশেষ করিয়া স্ত্রীজনের সন্নিধি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া ভূতগণের সহিত স্থান ত্যাগ করিলেন।]

২। কুমার ৮।৫০—৫২ শ্লোক দ্রঃ

গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বিশেষ করিয়া চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে' বলিবার কারণ এই যে জয়দেবের কবিতায় "যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্" তবেই পাঠকের সেই কাব্যের ভোজে নিমন্ত্রণ জুটিবে একথা কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন; কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত সাধনার সহায়ক করিয়া তিনি কাব্যের সৃষ্টি করেন নাই। বিদ্যাপতির কাব্যেও, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি"। কবির সহজ প্রতিভা তাঁহাকে যে-পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে সে-পথে, জয়দেবেরই মতো, কোন বিশেষ ধর্মমতের অনুশাসন মানিয়া তাঁহাকে চলিতে হয় নাই। এই কারণে ঈশ্বর অপেক্ষা জগৎ ও জীবন তাঁহাদের কাব্যে অনেক বেশি পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গোবিন্দদাসের রচনা এই প্রসঙ্গের একটি সুন্দর উদাহরণস্থল। গোবিন্দদাস জন্মসূত্রে চৈতন্যদেবের পার্শ্বদগণের ভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে গৌড়ীয় সাধনতত্ত্ব একটি নির্দিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া ভক্তিরসাশ্রিত পদও তিনি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গোবিন্দদাসের চিত্ত প্রধানতঃ লীলা-বিলাসের দিকে, ভাবগম্ভীর আত্মোপলব্ধির দিকে নয়। এই কারণে পদাবলী-সাহিত্যের সমালোচকগণ তাঁহাকে রচনাভঙ্গীর দিক হইতে স্বভাবতঃ বিদ্যাপতির উত্তরপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রধান লক্ষ্য। ঈশ্বরের সহিত সেখানে কবির যে সম্পর্ক তাহা কবির জীবনকে তথা কাব্যকে, আচ্ছন্ন করে নাই। বিশ্বের সৌন্দর্য ও কল্যাণ কবিকে যেখানে সহজ কবিত্ব-ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে

ঈশ্বরপ্রেম তাহার সহচর হইয়া কোথাও কোথাও আসিয়াছে মাত্র, কবির অস্তিত্বে সর্বময় হইয়া ওঠে নাই। এ কথার অর্থ এমন নয় যে কবির অনুভূতিতে দৈন্য আছে; বরং অনির্দেশ্য সৌন্দর্যের রহস্যময়তা উল্লিখিত কবিতানিচয়ে এবং আরও বহু কবিতায় ভাষা পাইয়াছে। এইখানেই এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিবার পূর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিব যে রবীন্দ্রনাথের যে অনুভূতি এই কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি মাত্র, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মসাধনার তত্ত্ব নয়, অপরপক্ষে বৈষ্ণবপদাবলীতে সাধনতত্ত্ব কবির কবিত্বে মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকতার সহিত যেখানে রোম্যান্টিক অনির্দেশ্য-হেতু ভাবাকুলতা আসিয়া মিলিয়াছে গীতাঞ্জলির চরম কবিত্ব সেখানে।

"সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।"

এখানে যে রহস্যময় ব্যাকুলতার প্রকাশ তাহাই এই কবিতার প্রাণ। দ্বিতীয়তঃ যে জয়দেব গোস্বামীর শৃঙ্গাররসাশ্রিত লৌকিক কাব্যকে রাধাকৃষ্ণের বীজমন্ত্রে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবগণ শোধন করিয়া লইয়াছেন ও গ্রন্থকারকে আপন আপন সম্প্রদায়ের পুরোধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে যেমন "বিলাস-কলা"ই সর্বময়, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও তেমনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগতেরই

প্রাধান্য। অবশ্য জয়দেবের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে যে নিরঙ্কুশ দেহচর্চা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার লেশমাত্র নাই, তবে যাহা আছে তাহা সাধকের আত্মবিলোপী ঐকান্তিকতা নয়, জগতের সৌন্দর্যের প্রতি উন্মুখতা। যে-জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রামে নিয়ত সৌন্দর্যের নব নব তরঙ্গ তুলিতেছে তাহাই কবির কাব্যে ধরা দিয়াছে।

"এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।
এই যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ 'পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।"

অথবা

"এস হে এস, সজল ঘন,
বাদল-বরিষণে ;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ জীবনে।
এস হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কানন ভূমি ;
গগন ছেয়ে এস হে তুমি
গভীর গরজনে।
ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।

উছলি উঠে কলরোদন
নদীর কূলে কূলে।
এস হে এস হৃদয়-ভরা,
এস হে এস পিপাসা-হরা,
এস হে আঁখি-শীতল-করা,
ঘনায়ে এস মনে।”

ইহা পুরাপুরি বর্ষার কবিতা। বর্ষা এখানে যে শুধু উদ্দীপন হিসাবে আসিয়াছে তাহা নয়। অথচ প্রকৃতি সম্পর্কে এই কবিতায় যে ভাবাকুলতা, তথাকথিত বৈষ্ণব প্রেরণায় রচিত গীতাঞ্জলির অপরাপর কবিতায় তাহা সমান ভাবে বর্তমান এবং প্রধানতঃ কবিতাগুলির কাব্যত্বের দাবী এই ভাবাকুলতাকে আশ্রয় করিয়াই। ইহাই অধ্যাত্ম অনুভূতি লইয়া কাব্যবিলাস।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব যে এখানে অতিক্ষীণ, আধ্যাত্মিকতাও ও যে এখানে ঐকান্তিক নয়, তাহা বুঝিবার পক্ষে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। গীতাঞ্জলিতে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত সামাজিক সমস্যা, দেশাত্মবোধ, ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত কতগুলি কবিতা আছে এবং সেগুলি যে শুধু একই গ্রন্থের আধারে পরিবেষিত ।হইয়াছে তাহা নয়, সেগুলির রচনাও হইয়াছে ইহাদের সহিত একযোগে। যাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে

“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারোমাস।”

তিনি কি বৈষ্ণবের 'অখিলরসামৃতমূর্তি ?

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সকলই থাক পড়ে,
রুদ্ধ গৃহে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে"

যাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে তিনি কি বৈষ্ণব ? অন্যত্র চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদকে যিনি

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয়, নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা"

বলিয়া যিনি ধিক্‌কৃত করিয়াছেন তিনি কি বৈষ্ণব ?

উপনিষদের ভাবেও গীতাঞ্জলির কতগুলি কবিতা অনুপ্রাণিত বলা হইয়া থাকে।

"সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর ॥"

এ-কবিতায় যিনি অরূপ, যিনি বর্ণ-গন্ধ-গীতির অতীত তিনি রূপের লীলায় নিজেকে অধিকতর করিয়া পাইতেছেন, এই ভাবটি আছে। পরের স্তবকে

"তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলিই যায় খুলে,—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥"

এই যে ছায়ামালিন্যহীন আলোকের কায়াবলম্বন, পূর্ণের এই ভঙ্গুর দুঃখময় পার্থিব বন্ধন স্বীকার ইহার মধ্যে উপনিষদ্‌-কথিত ব্রহ্মের স্বরূপের আভাস আছে। উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"………শুভ্রভাস,
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জন প্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।"

ইহার সহিত বৈষ্ণবের গোলোকপতির কোন সঙ্গতিই নাই। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার আঙ্গিকের যে-সাদৃশ্য আছে, তাহা অনিবার্য কারণেই আসিয়াছে। সে কারণ এই যে প্রেম-সম্পর্কের বর্ণনা পদাবলীতে আছে, এখানেও আছে, উভয়কেই

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আওতায় আনা চলে এবং প্রেমের পক্ষে যাহা কিছু উদ্দীপন ও সঞ্চারী বিভাব-অনুভাব তাহা উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এ-কবিতায় লীলা অংশই প্রবল ও এইখানেই ইহার কাব্যত্ব এবং সেখানে উপনিষদের দান কিছুই নাই। কবি এখানে সম্পূর্ণ মৌলিক। 'নৈবেদ্যে'র কবি অধ্যাত্মমানসের আকাশে ও আমাদের সংসার-সীমার মধ্যে, নীড়ে, ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কে নিঃসংশয়,

"পিতামাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার
পুত্র আমার মিত্র আমার" —রূপে

তাঁহাকে বিরাজমান দেখিয়া পরিতৃপ্ত; গীতাঞ্জলিতে কবি স্থির বিশ্বাস-প্রত্যয়ের পরিবর্তে নিখিলসৌন্দর্যসার পুরুষের সংশয়-সুন্দর রহস্যময় মধুর অনুভূতিতে আবিষ্ট।

গীতাঞ্জলিতে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে; ইন্দ্রিয়-ভোগের জগতের প্রতি ভোগোন্মুখতা (sensuousness) এবং প্রাগুক্ত ব্যাখ্যাতীত রহস্যময় বিরহবোধ দ্বারা সেগুলি অনুপ্রেরিত বলিয়া সেগুলিতে কালিদাসের প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। "বর্ষাঋতু রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিরহ জাগায় সেটি অধিক স্থলেই প্রিয়ার নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের। কালিদাস যে বিরহটি প্রিয় ও প্রিয়ার অবিনাশী প্রেমের মধ্যে গড়ে তুলেছেন, বর্ষাকালের যে বিরহ সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় কেবলমাত্র তরুণ ও তরুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই বিরহই তরুণ তরুণীর সম্পর্ক বর্জন করে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধরা-ছোঁওয়া যায় না এমন যে একটি অশরীরী আকিঞ্চন আছে তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে।"—কবি পরিচিতি, বর্ষা-কাব্যের ক্রমবিকাশ পৃঃ ৭৯ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার কবি বলিয়া সমধিক খ্যাত। উভয়ের বর্ষা-বর্ণনায় আবার নিগূঢ় সাদৃশ্য বর্তমান; চিত্র-কল্পনায় এবং বিরহের বর্ণনায় বর্ষাঋতুকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করায় এই সাদৃশ্য সমধিক প্রকাশমান। 'মেঘদূত' বিরহের কাব্য, 'ঋতু-সংহারে'ও সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অপরাপর ঋতু-বর্ণনা অপেক্ষা বর্ষার বর্ণনা সেই কারণে এইখানে বিশিষ্ট। মেঘদর্শনে যে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ" হইয়া থাকে মেঘদূতের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দীর্ঘকাল অনুরণিত হইয়াছে। "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'নববর্ষা' প্রবন্ধে কবি লিখিতেছেন, "নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জননান্তর-সৌহৃদানি' মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।" এই উক্তির দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয় যে নিম্নোক্ত কবিতাগুলির এবং ইহাদের অনুরূপ কবিতাগুলির প্রেরণার মূলে কালিদাসীয় কাব্যের ভাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করিয়া আছে।

গীতাঞ্জলির যে কবিতাটি "আষাঢ় সন্ধ্যা" নামে সঞ্চয়িতায় স্থান পাইয়াছে সেই কবিতাটিকে এই আলোকে পরীক্ষা করা যাউক।

"আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন মনে
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে॥

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ আকুল করে ভিজে বনের ফুল।

আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে॥"

কাব্য বিচারে এ-কবিতা কবির মৌলিক সৃষ্টি সন্দেহ নাই। আষাঢ়ের দিবাবসান বেলায় অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরিতেছে। বর্ষণসিক্ত যূথীবন হইতে গন্ধ-তরঙ্গ সন্ধ্যার অন্ধকার ছাইয়া ফেলিয়াছে ও কবিচিত্তে বড়ই শূন্যতা, বড়ই একাকিত্ববোধের সঞ্চার করিতেছে। এই শূন্যতা ভরিয়া তুলিবার মতো সুর তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠে জোগাইতেছে না। প্রত্যহের বাঁধা অভ্যস্ত জীবনের পথ হইতে কোন মনোরম ভুলের পথে চলিবার জন্য কবি অন্তরে আকুলতা অনুভব করিতেছেন।

কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে একান্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্যে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া সহজেই পাঠক চিনিতে পারেন। কিন্তু বর্ষার আবির্ভাবের ফলে মনুষ্যচিত্তের বিচিত্র ও অনির্দেশ্য-হেতু যে বিরহ-বোধের কথা আলোচিত হইয়াছে কালিদাসীয় কাব্যের সেই ভাবটিই এই কবিতার অবলম্বন।

উদ্ধৃত কবিতাটিতে যে রহস্যময় বেদনাবোধ আছে তাহা নিম্নোক্ত কবিতায় "চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের" সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া নবতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

"গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।"

এই অনির্দেশ্য-কারণ বিরহবোধের কাব্যত্ব নিম্নোক্ত স্তবকের সুনিশ্চয় দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে ;—

"বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

কিন্তু এই সেই "চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়", এ কবিতায় তিনি ভগবান হইয়াছেন। তিনি কবিকে এমন রাত্রিতেই ডাকেন। 'মালিনী' হইতে উদ্ধৃত কাব্যাংশে এবং এখানে—উভয়স্থলেই আমরা দেখিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুভূতি কবিচিত্তে প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত সৌন্দর্যাবেশের ফল। জ্যোৎস্না-যামিনীতে ভাবাবিষ্ট রাজকন্যা মালিনী ও বর্ষা-রজনীর সুখসুপ্তজন উভয়েরই "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", উভয়ের চিত্তেই "জননান্তর-সৌহৃদানি"র উদ্বোধন, এবং "চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ে"র জন্য উভয়েই "পর্যুৎসুকী"।

প্রকৃতির রম্যতা হইতে মানবচিত্তের যে বিহ্বলতা কালিদাসের কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে সেই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আপন ভাবকল্পনার পথে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়া

অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মূলতঃ তাঁহার এই প্রেরণা কালিদাসের কাব্য হইতেই গৃহীত। ঋতুসংহারে বিবিধ শ্লোকে প্রকৃতির রম্যতা মানবচিত্তে এক অজ্ঞাত-স্বরূপ বিরহ-বোধের সৃষ্টি করিতেছে,—

সিতোৎপলাভাম্বুদচুম্বিতোপলাঃ
সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ।
প্রবৃত্ত-নৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ
সমুৎসুকত্বং জনয়ন্তি ভূধরাঃ॥ বর্ষা-বর্ণনম্, ১৬

[চারিদিকে যাহাদের ঝর্ণাগুলি বহিয়া চলিয়াছে, শ্বেতকমলপ্রভ মেঘগুলি যাহাদিগকে চুম্বন করিতেছে, ময়ূরগুলি যাহাদের উপরে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে সেই সব উপলখণ্ডে শোভিত পর্বতগুলি হৃদয়ে উৎকণ্ঠা জন্মাইতেছে।]

কদম্বসর্জার্জ্জুন কেতকীবনং
প্রকম্পয়ংস্তৎকুসুমাধিবাসিতঃ।
স-শীকরাম্ভোধরসঙ্গশীতলঃ
সমীরণঃ কং ন করোতিসোৎসুকম্॥ ঐ, ১৭

[বর্ষার বারিকণার সংস্পর্শে শীতল হইয়া কদম্ব-শাল-অর্জুন-কেতকী বন কম্পিত করিয়া ও সেই বনের সৌগন্ধ্যে আমোদিত হইয়া সমীরণ কাহার প্রাণ না উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে ?]

বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈ-
র্মৃগৈঃ সমন্তাদুপজাতসাধ্বসৈঃ।
সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী
সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ॥ ঐ, ৯

[চঞ্চল কমল নয়নে যাহাদের মুখের শ্রী সাধিত হইয়াছে সেই ভয়চকিত মৃগকুলে পূর্ণ সৈকতিনী বনস্থলীর দর্শনে "লোকের চিত্ত যেন কেমন অধীর, উৎকণ্ঠাময় হইয়া উঠিতেছে"—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।]

ভিন্নাঞ্জন-প্রচয়-কান্তি নভো মনোজ্ঞং
বন্ধূক-পুষ্প রচিতারুণতা চ ভূমিঃ।
বপ্রাশ্চপক্ককলমাবৃত-ভূমি-ভাগাঃ
প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভুবি কস্য যূনঃ॥ শরদ্বর্ণনম্, ৫

[দলিত অঞ্জনবৎ মনোরম নভোমণ্ডল, বাঁধুলী ফুলের আভায় আরক্ত কান্তি বসুন্ধরা, সুপক্ক ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া পরিশোভমান শস্যক্ষেত্র আজ কোন্ যুবকের না হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল করিয়া তুলিতেছে ?]

শেফালিকা-কুসুমগন্ধ-মনোহরাণি
স্বস্থ-স্থিতাণ্ডজ-কুলপ্রতিনাদিতানি।
পর্যন্ত-সংস্থিত—মৃগী-নয়নোৎপলানি
প্রোৎকণ্ঠয়ত্যু-পবনানি মনাংসি পুংসাম্॥—শরদ্বর্ণনম্ ১৪

[শেফালিকা-কুসুমের গন্ধে মনোহর, পুলকিত বিহগ-কুলের কাকলীতে প্রতিধ্বনিত, প্রত্যন্তভাগে আসীন মৃগীকুলের নয়নকমলে পরিশোভিত উপবনগুলি মানুষের চিত্ত উৎকণ্ঠাপূর্ণ করিতেছে।]

কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুর্বিধুন্বং-
স্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে
পত্রান্ত-লগ্ন-তুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ।—ঐ ১৫

[প্রভাতে যে সমীরণ কহ্লার-পদ্ম কুমুদগুলিকে বারবার কম্পিত

করিয়া তাহাদের সহবাসে অধিকতর শীতলতা লাভ করিয়া, তরু-লতার পত্রপ্রান্তে সংসক্ত শিশিরবিন্দুগুলি প্রকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে চিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে।]

নিম্নে উদ্ধৃত বসন্তের কবিতাটিতে এই ব্যাখ্যাতীত "নামহীন বাসনা", এই রহস্যময় বিরহবোধ আর কোন তত্ত্ব দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই, এখানে যাহার রহস্যময় অস্তিত্ব ও বিচিত্র বিরহ কবিকে পর্যুৎসুকী করিয়া তুলিতেছে সে ভগবান নয়, কবির আপন চিত্তের অমেয় সৌন্দর্যবোধ ; কখনও সে রবীন্দ্র-কাব্যে অশরীরিমাত্র, কখনও সে শরীরী, সুন্দরী নারী, সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধয়িত্রী, কবির কাব্য-লক্ষ্মী। .পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

"আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
একী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তে সকরুণ সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।
ওগো জানিনা কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব পল্লব-মর্মর ছন্দে,

চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে ॥" —গীতাঞ্জলি।

এই কবিতায় সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট; কবিতার শব্দচয়ন, পরিবেশ-রচনা, পারিপাট্য, হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রকাশমান এবং কালিদাসীয় উক্ত বিশিষ্ট ভাবটি ইহার প্রেরণার মূলে রহিয়াছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যে উক্ত ভাবটি অবলম্বন করিয়া কালিদাসের পথেই কালিদাসকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন ইহা বলিবার কারণ এই যে কালিদাসের কাব্যের উক্ত ভাবটি এখানে গভীর ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কবির নিজের মনের ভাবাবেশের স্পর্শ ইহাতে লাগিয়াছে এবং তাহাতে সহৃদয়-চিত্তে কবিতার ভাবের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে আমরা কালিদাসীয় রোম্যান্টিক কবি-মানসের একটি বিশেষ অবস্থান, একটি দৃষ্টিভঙ্গী, কাব্যোপকরণরূপে কী ভাবে রবীন্দ্রকাব্যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তত্ত্বের দ্বারা তত্ত্বের প্রেরণা লক্ষ্য করিয়াছি ও প্রসঙ্গতঃ প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে কালিদাসীয় কাব্যের অলঙ্কার ও ভাব রবীন্দ্রকাব্যকে যথাক্রমে ভাব ও অলঙ্কারের প্রেরণাদ্বারা কেমন করিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের উপমা প্রয়োগ ব্যাপারে সাদৃশ্যও এই প্রসঙ্গে আমরা বিচার করিব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে তাহাতে প্রস্তাবিত বিষয় সবিশেষত্ব হইতে নির্বিশেষত্বে, ঐককালিকত্ব ও ঐকদেশিকত্ব হইতে সার্বকালিকত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়; ব্যক্তিসত্তা বা বস্তুসত্তা বিশ্বসত্তায় পরিণতি লাভ করে; স্পষ্টরেখার বন্ধনে ধৃত প্রতিকৃতির রেখাবন্ধন ক্রমে ধূসরতার মধ্যে বিলীন হইয়া এক রহস্যময় ব্যাপকতার আভাস আনয়ন করে। উদাহরণ স্বরূপ 'চিত্রা' কাব্যের 'উর্বশী' কবিতাটিকে গ্রহণ করিতে পারি। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে উর্বশীর বর্ণনা এই :—

> আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
> ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—
> তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্র শান্ত ভুজঙ্গের মতো

পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যথাযোগ্য পটভূমির উপরে নির্দিষ্ট রেখার বন্ধনে এ একখানি নারীচিত্র। অন্ত্যপূর্ব স্তবক পর্যন্ত এই চিত্রখানির যথাযোগ্যতা রক্ষিত হইয়াছে। অন্তিমস্তবকে এই চিত্রের রেখা-বন্ধনের বর্ণাবলি গলিয়া গলিয়া পড়িয়াছে; যাহা এক ও অখণ্ড ছিল, স্থূল দেহবন্ধনে ধরা দিয়াছিল, তাহা এক বহু-ব্যাপক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়-প্রায় অনুভূতির বিষয়ীভূত হইয়াছে। যে ছিল সুন্দরী, সে বিদেহ সৌন্দর্যমাত্রে পর্যবসান লাভ করিয়াছে।

"ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে।"

এ উর্বশী 'অবন্ধনা', এ শুধুই 'দূরস্মৃতি'।

উর্বশী কবিতার রচনাকাল ১৩০২ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, বলাকার 'শা-জাহান' কবিতা রচিত হইয়াছে ১৩২১ সালের ১৪ই

কার্তিক। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ১৯ বৎসর, কিন্তু কবির চিত্তের এই বিশেষ প্রবণতার, দেহীকে বিদেহ সৌন্দর্যে পরিণাম দিবার এই আগ্রহের প্রকাশ সমান রহিয়াছে।

"জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।"

এ পর্যন্ত সম্রাট্-প্রেয়সীর বর্ণনা দেহসীমার বন্ধনে ধরা হইয়াছে, কিন্তু কয়েক পংক্তি পরেই

"যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।"

উপরের দুইটি উদাহরণে সসীমের সীমাহীনতা বা বৃহত্তর ব্যাপ্তির মধ্যে আকস্মিক পরিণতি দেখা দিয়াছে, স্থূল বস্তুদেহ সূক্ষ্ম বিদেহিতায় হারাইয়া গিয়াছে, গুণধর্মের আধার শুধুই গুণ-ধর্মে পরিণাম লাভ করিয়াছে।

এইবার স্থূল বস্তুবাচক (concrete) পদার্থ যেখানে স্থূল পদার্থের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কবি-কল্পনা দ্বারা নূতন মহিমার আরোপের ফলে ব্যাপকতা লাভ করিয়া ও abstract বস্তুর সাদৃশ্য

লাভ করিয়া রসিক-চিত্তকে নবতর রসাস্বাদনের পথে মুক্তি দিয়াছে এমন কয়েকটি উদাহরণের আলোচনা করা যাইতেছে।

"সোনার তরী" কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় 'পূজার ছুটির শেষে' পিতার প্রবাস-যাত্রায় বাধা তাহার চারি বৎসরের কন্যাটি। দ্বারপ্রান্তে সে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে; "যেতে নাহি দিব" বলিয়াই যেন পিতার গমনের পথে সে অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে—এমন তার মুখভাব। তথাপি কর্তব্যের দায়ে পিতা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কবিতাটিতে এইবার ব্যক্তি-চিত্তের বিরহবোধ বহির্বিশ্বে যেন ছড়াইয়া আছে এমন অনুভূতির দীর্ঘ বর্ণনা। কিছুদূর বর্ণনার অগ্রগতির পরেই কবি বলিলেন,

"………দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ যুগান্তর ক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।"

ইহার পরে স্তবকোচিত ছেদ এবং তাহার পরের পংক্তি

"কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী।"

তাহার পরে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী মৃত্যুকে বাধা দিবার ব্যর্থ-করুণ প্রয়াসের কথা। মাঝখানে একবার কন্যাকণ্ঠের সঙ্গে abstract বিশ্বকণ্ঠের আর্তস্বরের একটি উপমা—

"………চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা কণ্ঠস্বরে, শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধবাণী।"

এইবার যাহার জন্য এত প্রস্তুতি, এত অপেক্ষা সেই চিত্রখানি এতক্ষণে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল,

"বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।"

এখানে ব্যক্তি-চিত্তের বিরহবোধ বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং চারি বৎসরের কন্যাটি দেখা দিয়াছে বসুন্ধরারূপে। এই ভাবটির প্রকাশের মধ্যেই এই দীর্ঘ এই সাত পাতা-ব্যাপী কবিতার সার্থকতা। বিরাটের আভাস পাঠকচিত্তে ঘনাইয়া তুলিবার প্রয়াস কতদূর সার্থক হইয়াছে বা কবিতাটি এত দীর্ঘ না হইলে কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত সে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে ঠিক এই প্রকার প্রয়াস কালিদাসের কাব্যে আমরা দেখিতে পাই। নিম্নে এই প্রসঙ্গে উদাহরণকল্পে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইতেছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকে যে আকৃষ্ট হইয়াছিল 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে ইহার উদ্ধৃতি তাহার প্রমাণ। শ্লোকটি এই,—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।

নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেবরেজে ॥

—কুমার ৭।১১

[বিবাহোচিত মঙ্গল স্নানে পরিশুদ্ধদেহা ও পতিমিলনের যোগ্য বসন ধারিণী পার্বতী বর্ষাস্নাতা ও কাশ কুসুমের আচ্ছাদনে পরিশোভিতা বসুন্ধরার ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন।]

কবি এখানে যে উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা একটি অলঙ্কার মাত্র নয়; উমাকে সুন্দর দেখাইতেছিল, শুধু ইহাই কবির বক্তব্য নয়; একটিমাত্র উপমায় যে ছিল শুধু দৃষ্টিগোচর, শুধু সুন্দরী, তাহাকে অবলম্বন করিয়া পাঠকের মন নূতন সৌন্দর্যলোকে মুক্তিলাভ করিল। বর্ষাবিধৌতা কাশকুসুমবসনা বসুন্ধরার সহিত তুলনায় যে গ্লানিরাহিত্য ও পবিত্রতা, মহেশ্বরের সহিত যাহার পরিণয় হইবে তাহার লোকাতীত যে গৌরব ও অধৃষ্যতা—তাহা যেন এই উপমাটির অপেক্ষা করিয়াছিল। কবি এখানে গৃহের সৌন্দর্যের আধারকে বিপুলতর পটভূমিতে বিশ্ব-সৌন্দর্যের আধাররূপে চিত্রিত দেখিয়াছেন।

রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে একটি উপমাদ্বারা কবি ইন্দ্রিয়-ভোগের অতীত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বরবেশী অজ বিদর্ভরাজ-সভায় উপস্থিত।

দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং
নিন্যে বিনীতৈরবরোধরক্ষৈঃ।
বেলাসকাশং স্ফুটফেনরাজি-
র্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭।১৯

[বিনীত অন্তঃপুররক্ষকগণ কর্তৃক ক্ষৌমবসনধারী তিনি (কুমার

অজ) বধূ ইন্দুমতীর নিকটে নীত হইলেন, নবোদিত চন্দ্রের কিরণ-স্পর্শে চঞ্চল ফেনোচ্ছল সমুদ্র যেন বেলাভূমির দিকে আকৃষ্ট হইল।]

একটি উপমার বৈশিষ্ট্যে মিলনের একখানি ছবি সমস্ত মাধুর্য ও পবিত্রতা নিয়া ইহাতে মুহূর্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং শুধু তাহাই নয়, পূর্বকথিত ব্যাপকতার ও বিরাটত্বের আভাস ইহার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত পংক্তিনিচয়ের উপমায় এই মাধুর্য ও ঔদার্য প্রকাশমান—

"উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষে-নিহত
একটি নয়ন সম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।

—ধ্যান, মানসী

কিন্তু এ সাদৃশ্য স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় চারিবৎসরের কন্যার ছবিটি যে বসুন্ধরার চিত্রটির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কল্পনাকে বিচার করিলেই দেখা যাইবে কালিদাসের উক্ত প্রকার উপমার প্রভাব দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকিবে বলিবার সার্থকতা কোথায়।

অলঙ্কার হইতে ভাব ও চিত্রের কল্পনা

ভাব ও চিত্রধর্মের সাদৃশ্য হইতে যেমন উপমার সৃষ্টি হইয়া থাকে তেমনি বিপরীত রীতিতে উপমাদি অলঙ্কার হইতে ভাব ও চিত্রের কল্পনাও অতি স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'মোর চারি-বৎসরের কন্যাটির মতো' বসুন্ধরার চিত্রের উপস্থাপনায় ভাবের যে ব্যাপকতার সহিত বিপুলতর চিত্রকল্পনা রহিয়াছে তাহাতে কালিদাস শ্লোকমাত্র-বিস্তার একটি উপমায় অতি সংহত ভাবে যাহা করিয়াছেন তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি সুদীর্ঘস্তবকে যাহা পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার শেষফল একটি চিত্র, এবং এই চিত্রের উপকরণ একটি মাত্র উপমা। এই উপমাটিকেই এই স্তবকে বহুবিস্তারিত করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কালিদাসের শ্লোকটিতে যেমন দেখিয়াছি উপমা উপজীব্যভাবকে নূতন সম্ভাবনার পথে অগ্রসর করিতেছে, নূতন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিতেছে, বোধের রাজ্য হইতে আমাদিগকে কল্পনা ও অনুভূতির রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের উপমায়ও তেমনি ভাবের নূতনতর, ব্যাপকতর সূচনা ঘটিয়াছে—তাহা ব্যক্তি-চিত্তের বিরহ হইতে বিশ্বব্যাপী বিরহবোধের কল্পনা।

উর্বশী ও শাজাহান কবিতার উদ্ধৃত অংশের সহিত 'যেতে নাহি দিব' কবিতার এই দিক হইতে একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে; তাহা এই, উভয় কবিতায়ই ঐকদেশিকত্ব হইতে সার্বভৌমত্বে, বিশেষ হইতে নির্বিশেষত্বে প্রয়াণ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র সীমা-বন্ধন হইতে বিরাট্ত্বের, অসীমত্বের আভাস ফুটাইয়া তোলা এখানে কবির কাজ। ইহাই অলঙ্কার হইতে ভাবের প্রেরণা। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা সবিশেষ আলোচনা করিব।

কালিদাসের কাব্য হইতে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির বৈশিষ্ট্যে লক্ষণাক্রান্ত অনুরূপ বহু শ্লোক সংকলন করিয়া উক্ত আলোচিত তত্ত্ব প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে।

ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা
পর্যাপ্তচন্দ্রেব শরত্ত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা-
ভূয়োবভৌদর্পণমাদধানা॥

—কুমার ৭।২৬

[নবীন ক্ষৌমবসন ধারণ করিয়া নূতন দর্পণ হাতে নিয়া পার্বতী ফেনপুঞ্জলগ্না ক্ষীরোদসমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায়, চন্দ্র কিরণোদ্‌ভাসিত শারদ রজনীর ন্যায় বিরাজ করিতে ছিলেন।]

এখানেও পার্বতীকে বিপুলাবিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক করিয়া দেখিবার প্রয়াস, সেই প্রাগুক্ত বিরাট্‌ত্বের বোধ ঘনাইয়া তুলিবার মধ্যেই শ্লোকটির সৌন্দর্য।

বস্তুকে ভাবে, সুন্দরকে বিদেহ সৌন্দর্যমাত্রে পরিণতি প্রদান

কালিদাসের কাব্যে শরীরীকে অশরীরী সৌন্দর্যমাত্রে পর্যবসান-লাভ করিতে দেখা যায় নিম্নোক্ত শ্লোকরাজিতে। আশা করা যায় রসিকজন সহজেই স্বীকার করিবেন যে এই শ্লোকরাজির ভাব বিশেষ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ।

রামগিরি-প্রবাসী যক্ষ পত্নীবিরহে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়তমাকে খুঁজিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে বিরহীর দৃষ্টিতে প্রিয়তমা মিশিয়া আছে,—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি[১] সাদৃশ্যমস্তি ॥ —উত্তরমেঘ, ৪৩

[শ্যামালতায় অঙ্গলতিকার, চকিত হরিণীর দৃষ্টিতে তোমার চাহনির, চন্দ্রে তোমার মুখচ্ছায়ার, ময়ূরের কলাপে তোমার কেশরাশির, তটিনীর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মিভঙ্গে তোমার ভ্রূভঙ্গীর সাদৃশ্য খুঁজিতে যাই। হায় কোপনে, কোন একটি বস্তুতে তোমার সাদৃশ্যও খুঁজিয়া পাই না।]

ইন্দুমতীর বিয়োগে আজও তেমনি প্রকৃতিতে প্রিয়াকে খুঁজিতেছেন। সৌন্দর্য-সাদৃশ্যে প্রিয়াকে বহুধা-বৈচিত্র্যে প্রকাশমানা দেখিয়াও দেহের বন্ধনে তাঁহাকে না পাইয়া বিরহী রাজার হৃদয় সান্ত্বনা মানিতেছে না।

কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং কলহংসীষু মদালসং গতম্
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনধূত-লতাসু বিভ্রমাঃ ॥
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং নিহিতাঃ সত্যমমী গুণাস্ত্বয়া।
বিরহে তব মে গুরুব্যথং হৃদয়ং ন ত্ববলম্বিতুং ক্ষমাঃ ॥

[কোকিলা-কণ্ঠে তোমার কলভাষণ, কলহংসীতে মদালসগতি, হরিণীতে চঞ্চল দৃষ্টি, বায়ুকম্পিত লতায় বিলাসলীলা,—স্বর্গপ্রয়াণে সমুৎসুক হইলেও আমার দিকে চাহিয়া তুমি (স্মরণচিহ্নস্বরূপ) রাখিয়া গিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার বিরহে দুঃসহবেদনাপীড়িত আমার হৃদয় এ সকলে স্থির হইতে পারিতেছে না।]

১। পাঠান্তরে "ভীরু সাদৃশ্যমস্তি।"

মেঘদূত ও রঘুবংশের এই শ্লোকদ্বয়ের ভাব পরবর্তী কাব্যে অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃতকাব্যসুলভ এই ভাবপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের হাতে অভিনব হইয়া উঠিয়াছে, সৌন্দর্যের তালিকা মাত্র হয় নাই।

"যে ছিল তার ছেলেবেলার সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি'।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাতার গুনগুনানি।"

—পলাতকা, নিষ্কৃতি।

বাংলা ভাষায় এই ভাবের উপস্থাপনা কবির শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত পংক্তিনিচয়ে এই ভাবটি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে কিন্তু আমরা কোন প্রভাবের কথা কল্পনা করিতে পারি না। ভাবসাদৃশ্য বশতঃই ইহা উল্লিখিত হইতেছে মাত্র। পূর্বতন ভাব এখানে কল্পনা-মৌলিকতায় নূতন চমৎকৃতি লাভ করিয়াছে।

"আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি—সবচেয়ে, মানি, তুমি ছিলে এক দিন।"

—পূরবী, কৃতজ্ঞ।

সোনারতরীর 'মানসসুন্দরী' কবিতায় দেহসীমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্বে অস্তিত্বের পরিব্যাপ্তি এবং বিশ্বে পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য-রাশির দেহবন্ধে সংহরণ—এই উভয় ভাবের উদাহরণ রহিয়াছে।

"… … … … …এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল, ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধ-শুভ্র বিরহ-শয়ন।"

অথবা "………মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই ; বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।"

যদিও এই দ্বিতীয় অংশে কালিদাস ব্যতীত অপর কবির শ্লোকের ভাবানুবাদ রহিয়াছে (মূল শ্লোক ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে)

তথাপি উভয় উদ্ধৃতিই কালিদাসের উক্ত বিখ্যাত শ্লোকরাজির ভাবে অনুপ্রাণিত। এই শ্রেণীর শ্লোক যে সংস্কৃত কাব্যের বৈশিষ্ট্য। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ কালিদাসের কাব্যের মধ্যবর্তিতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

মানসস্থন্দরীর উদ্ধৃত অংশে যেমন ব্যক্তির অমূর্তসৌন্দর্যে পরিণতি প্রকাশমান, তেমনি নিম্নোক্ত অংশে অমূর্তসৌন্দর্যরাশির দেহবন্ধে প্রকাশের জন্য আকুতি।

"অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি।
নদী হতে, লতা হতে, আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশ ভরে ?"

আমাদের গৃহকোণের পরিচিত সৌন্দর্য যেখানে অকস্মাৎ বিরাট্ত্ব লাভ করে ইহা তাহার বিপরীত রীতি। 'বসুন্ধরা' কবিতায় বসুন্ধরাকে মানবী মূর্তিতে লৌকিক সম্পর্কের বন্ধনে ধরিবার মধ্যে, বিশ্বানুভূতি হইতে ব্যক্তি-চেতনায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ইহার উদাহরণ মিলিবে।

"হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে,

সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটিদেশ”

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যেই ক্ষুদ্রকে বিরাট্ স্বরূপের মধ্যে, আবার বিরাট্‌কে মানবের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র করিয়া, বিশ্বকে পরিচিত গৃহাঙ্গণ-সীমায় আনিয়া সৌন্দর্যোপভোগের আনন্দ সমানভাবে দেখা যায়।

ঋতুসংহারে বর্ষাবর্ণনায় বসুন্ধরা কবির নিকটে সুন্দরী নারীর ন্যায় ও বসন্তের বর্ণনায় নববধূর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বর্ষায়

(ক) “প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥” ৫

[বিদলিত-বৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামল তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্‌গত কন্দলীপত্রে, এবং বর্ষাকালজাত ইন্দ্রগোপকীটসমূহে সজ্জিত হইয়া বসুধা নীলমণি প্রভৃতি রত্নে ভূষিতা সুন্দরী নারীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।]

(খ) রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকে অযোধ্যা নগরীকে একটি নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ
শালাবিধিস্তম্ভ-গতৈশ্চ নাগৈঃ।
পূরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা
সর্বাঙ্গ-নদ্ধা ভরণেব নারী॥—রঘু ১৬।৪১

[অশ্বশালায় অশ্ব, গজশালায় বন্ধন-স্তম্ভে আবদ্ধ হস্তী ও বিপণিসমূহে নানাবিধ পণ্য লইয়া সেই নগরী অযোধ্যা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গভূষিতা কোন রমণীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।]

(গ) ঋতুসংহারে বসন্তের বর্ণনায় ধরিত্রী "রক্তাংশুকা নববধূঃ"।

"আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে হি সমাচিতেয়ং
রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ"। ১৯

[দীপ্তবহ্নিবৎ উজ্জ্বল-কান্তি, ফুলভারে অবনত বায়ুকম্পিত কিংশুকবনে সর্বত্র আচ্ছাদিত হইয়া ধরিত্রী রক্তাংশুকা নববধূর ন্যায় বিরাজ করিতেছে।]

ধরিত্রীকে বসন্তের রক্তাম্বরা নববধূবেশিনীরূপে কল্পনা ও অশোক কিংশুক-মল্লিকা প্রভৃতি ঋতুসংহারের বসন্ত-বর্ণনার উপকরণের প্রায় সবগুলি সংগ্রহ করিবার প্রয়াস 'মহুয়া' কাব্যের 'বরযাত্রা' কবিতায় আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্পর্কে লেশমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে গীতাঞ্জলির নিম্নোক্ত কবিতাংশে এই ভাবটি পূর্ব কথিত 'চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের' সম্পর্কে বিরহবোধের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে :—

"অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।

ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে ॥"

অলঙ্কার হইতে অলঙ্কারের প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের কবিতার সমালোচনাকল্পে কবির সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী পাঠকগণ নিজেদের কাছাকাছি অনুরূপ উপযুক্ত সাহিত্যিক আদর্শ না পাইয়া তাহাতে শেলির কবিতার লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শেলির কাব্যের যে লক্ষণগুলি টমসন রবীন্দ্রকাব্যে দেখিয়াছেন তাহা "Shelley's mythopea, his compound adjectives, his personifications, his unhappiness, especially his vague, poetical unhappiness."[১] এই লক্ষণগুলির মধ্যে প্রথমটির জন্য নিশ্চয়ই কবিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষায় সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বিশেষণ পদের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। তৃতীয়তঃ, কবিচিত্তের রোম্যান্টিক বিষাদ। ইহার সম্পর্কে আমরা পূর্বেই সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থতঃ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় personification বা সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ। আমরা এ বিষয়ে এবং তাঁহার কাব্যে abstract বা সূক্ষ্ম বস্তু-বিশ্লিষ্ট পদার্থ বা ভাবের সহিত বস্তুবাচক (concrete) পদার্থের সম্পর্ক উপমার মধ্যে কেমন ভাবে দেখা দিয়াছে তাহা আলোচনা করিব এবং কালিদাসের রচনা এই ব্যাপারে তাঁহার কাব্যে কেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বিচার করিব।

১। Rabindranath Tagore—His life and work.
—Thompson P. 68.

রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে শেলির সম্পর্ক কতটুকু ? টমসন একটি মজার কথা লিখিতেছেন, "I remember Loken Palit had a theory that Shelley must have known Sanskrit, because he personified abstractions so in the manner of its poetry."[১] কিন্তু শেলি সংস্কৃত জানুন আর না-ই জানুন রবীন্দ্রনাথের যে সকল বৈশিষ্ট্য শেলির কাব্যের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া টমসন বলিতেছেন তাহা কালিদাসের কাব্যের সহিত পরিচয় ও তাহার প্রতি অনুরাগ হেতু অনুসৃত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহু পূর্বের ও তাঁহার কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ জীবনব্যাপী। কাজেই সংস্কৃতের যাহা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও তাহার সহিত যাঁহার নিবিড় পরিচয় সেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই ব্যাপারে শেলির প্রভাব কল্পনা করিব কেন ? বিশেষতঃ যুক্তি হিসাবে এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কালিদাসের প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত শেলির প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শেলির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু প্রেরণা কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে লাভ করিয়া থাকেন তবে তাহা প্রধানতঃ ব্যক্তি-হৃদয়ের গীতিকাব্যসুলভ উচ্ছ্বাস, ক্ল্যাসিকাল কাব্য-ধর্মী সংস্কৃত সাহিত্যে, কিছু স্তব-স্তোত্রে ব্যতীত, যাহা দুর্লভ ছিল।

কালিদাসের ও শেলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কী অনুপাতে যে হইয়াছে সে সম্পর্কে টমসনের ধারণা নিচের উদ্ধৃতিতে প্রকাশ

১। ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৬৭—৬৮। বস্তুতঃ শেলি যে সংস্কৃত জানিতেন এমন কোন প্রমাণ নাই।

পাইয়াছে, "……I think we are justified in placing Western (which means, mainly, English) literature third among formative influences, after Kalidasa and the Vaisnavas."[১]

লোকেন পালিত যে মনে করিতেন যে শেলি সংস্কৃত জানিতেন, শেলি ও সংস্কৃত ভাষার কবিগণের উপমাপ্রয়োগরীতির সাদৃশ্য তাহার অন্যতম কারণ। (বলা বাহুল্য, লোকেন পালিতের এই ধারণা যুক্তি-সহ নয়।) শেলির উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য কী? "The figures of his poetry illustrate what is strange by what is familiar, and it is the shadows and spirits that are familiar. The autumn leaves scurrying before the wind remind him of "ghosts before an enchanter fleeing." The Skylark in the heavens is 'like a poet hidden in the light of thought.' The avalanche on the mountain is piled flake by flake, as thought by thought is piled in heaven-defying minds,

'Till some great truth
Is loosened, and the nations echo round,
Shaken to their roots'

—W. Raleigh, Some Authors পৃঃ ২৯৬

অর্থাৎ জানা ও অজানা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, concrete ও abstract —ইহাদের প্রত্যেকটিকে উপমান-উপমেয় ও উপমেয়-উপমানরূপে

১। ঐ গ্রন্থ পৃঃ ৬৭

প্রয়োগের দ্বারা রহস্যময় বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এখানে উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের রচনা হইতে কয়েকটি অনুরূপ বিশিষ্ট উপমা সংকলন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এরকম উপমা রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র।

কিন্তু উদাহরণ সংকলনের পূর্বে কালিদাসীয় কাব্যে ও রবীন্দ্র-কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগের ব্যাপারে উভয়কাব্যসুলভ একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সে-বৈশিষ্ট্য উভয় কবির উপমা-প্রয়োগে। সংস্কৃত-কাব্যমাত্রেই অলঙ্কারবহুল। কালিদাসের রচনা আবার বহু শতাব্দী ধরিয়া উপমা প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাও অলঙ্কারভূয়িষ্ঠ ; উপমা রবীন্দ্রনাথেরও যেন সহজ ভাষা।[১]

(১) আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা॥

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, প্রভাত সঙ্গীত।

(২) গত জনমের অভিশাপসম রব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্ট-হেন বেড়াইব পাছে পাছে।

—রাহুর প্রেম, ছবি ও গান।

(৩) দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা।

—সিন্ধুতরঙ্গ, মানসী।

১। "In his lectures and addresses he can never resist the temptation of a glittering simile." —Thompson. পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

(৪) চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।[১]

—নিরুদ্দেশ যাত্রা, সোনারতরী।

(৫) বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

—নিষ্ফল কামনা, মানসী।

উদ্ধৃত উপমা[২] পাঁচটি গতানুগতিক নয়, প্রকৃত চমৎকৃতি-সৃষ্টির ফলে এগুলি সুন্দর। ইহাদের মধ্যে শুধু তৃতীয় উদাহরণটিতে অজানাকে জানা দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অবশিষ্টগুলিতে ইহার ঠিক বিপরীত রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। চতুর্থ উদাহরণটির রীতি তৃতীয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত। রহস্যময়কে রহস্যময়দ্বারা, অজানাকে অজানা দ্বারা ব্যাখ্যার রীতি পঞ্চমটিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শেলির কাব্যে এগুলির অনায়াসেই স্থান হইতে পারিত। কিন্তু তাই বলিয়া, এবং শেলির কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল বলিয়া, এখানে শেলির প্রভাব কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। কালিদাসের কাব্যে স্থূল বাস্তবলোকের সহিত ইন্দ্রিয়াতিগ রহস্যময় এক রাজ্য এমন পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছে ও

১। তুলনীয়ঃ—সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে। —রবীন্দ্রনাথ।

২। এই শ্রেণীর অলঙ্কার উপমাগর্ভ বলিয়া সকল কয়টিকেই 'উপমা' এই সাধারণ নামে নির্দেশ করা হইতেছে।

উভয়ক্ষেত্র হইতে উপমান-উপমেয় এমন অনায়াস-সুন্দররূপে আদর্শ হিসাবে তাঁহার কাব্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে কালিদাসের কাব্যের সহিত পরিচয়-স্বীকারের পরে শেলিকে তাঁহার উত্তমর্ণ ঘোষণা করা নিরর্থক মনে হয়। কালিদাস হইতে কয়েকটি উপমাঘটিত উদাহরণ লইয়া পরীক্ষা করিলেই উভয় কবির মানস-সংযোগ ও সাধর্ম্য স্পষ্ট হইবে।

(ক) কুশপত্নী কুমুদ্বতী পুত্রলাভ করিয়াছেন, রজনীর শেষ যাম হইতে বুদ্ধি যেমন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়।

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ কুমুদ্বতী।
পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥[১]—রঘু ১৭।১

অথবা

(খ) পারসিকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥—রঘু ৪।৬০

[অনন্তর, সংযতচিত্ত যোগী যেমন তত্ত্বজ্ঞানবলে ইন্দ্রিয়রূপী রিপুগণকে পরাজিত করেন সেইরূপ পারস্যনৃপতিগণকে পরাজিত করিতে স্থলপথে অভিযান করিলেন।]

(গ) পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং
নির্বিষ্টহেমাম্বুজ-রেণু যস্যাঃ।
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো
বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥—রঘু ১৩।৬০

১। পূর্বমেঘের ৪০ নং শ্লোকে গম্ভীরা নদীর জল নির্মল অন্তঃকরণের ন্যায়। "গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে" ইত্যাদি।

[স্নানকালে যক্ষকামিনীদের স্তন স্বর্ণপদ্মের পরাগে শোভিত করে যে ব্রাহ্মসরোবর (মানস সরোবর) বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) কারণ যেমন অব্যক্ত (বা প্রধান) সেইরূপ সরযূর উৎপত্তিস্থল বলিয়া ইহা মুনিদের দ্বারা কীর্তিত হইয়া থাকে ।

(ঘ) সুতৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রা সুষুবে সমৌ ।
সম্যগারাধিতা বিদ্যা প্রবোধ-বিনয়াবিব ॥

—রঘু ১০।৭১

[সম্যক্ আয়ত্তা বিদ্যা যেমন তত্ত্বজ্ঞান ও বিনয় জন্মাইয়া থাকে সেই প্রকার সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন ।]

এই শ্লোক-চতুষ্টয়ে দেখিতে পাইতেছি কবি প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ দ্বারা, স্থূল কে সূক্ষ্ম দ্বারা, যাহা সুবোধ্য তাহাকে কল্পনাসাধ্য দুর্বোধ্যতর বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের উপমারই ইহা একটি সাধারণ লক্ষণ।

(ঙ) কল্পনাদ্বারা abstract বস্তুর concrete-এ রূপান্তর কেমন করিয়া চমৎকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাহার সুন্দর উদাহরণ।

"উমাস্তনোদ্ভেদমনুপ্রবৃদ্ধো
মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব ।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চি-
দ্বিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥ —কুমার ৭।২৪

[(কৈশোরে উত্তীর্ণ) উমার স্তনকুট্মলের ঈষদুদ্গম লক্ষ্য করা অবধি মাতা মেনকার অন্তরে (তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ

করিবার) যে বাসনা জাগিয়াছিল (বিবাহোচিত বেশে উমাকে সজ্জিত করিতে গিয়া) সেই বাসনাকে কোনমতে মেনকা তাহার ললাটে বিবাহকালোচিত তিলকরূপে রচনা করিলেন।]

(চ) নিচের শ্লোকটিতে concrete উপমেয়ের সহিত abstract উপমানের উপস্থাপনায় বিরাট্‌ত্বের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থ-সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশ-বনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুসুম-বিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৩৮

[ঊর্ধ্বে গমন্ করিয়া রাবণের হস্তদ্বারা উত্তোলনের ফলে যাহার সন্ধিগুলি শিথিল হইয়াছে, সুরসুন্দরীগণের যাহা দর্পণস্বরূপ ও কুমুদশুভ্র সমুন্নত শৃঙ্গসমূহে আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া মহেশ্বরের অট্টহাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান সেই কৈলাসগিরির তুমি আতিথ্য গ্রহণ করিও।]

'কুমুদ-শুভ্র' বিশেষণে তুষারাদ্রির যে স্নিগ্ধ চারুতা সম্পাদিত হইয়াছিল 'রাশীভূতঃ···ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ' বলায় মুহূর্তে তাহা বিরাট্, পবিত্র, অধৃষ্য ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও ইন্দ্রিয়গোচরকে কল্পনালোকে উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষণীয়।

(ছ) বিবাহার্থী কুমার অজ নব-নির্মিত সুরম্য রাজভবনে প্রবেশ করিলেন, যেন সাক্ষাৎ কামদেব বাল্যাবস্থা ত্যাগ করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিলেন।

"রম্যাং রঘুপ্রতিনিধিঃ স নবোপকার্যাং
বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস॥ —রঘু ৫।৬৩

(জ) তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং
কামীব কান্তা-হৃদয়ং প্রবিশ্য।
যথার্হমন্যৈরনুজীবিলোকং
সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥ —রঘু ১৬।৪০

[তিনি (কুশ) কামী ব্যক্তি যেমন কান্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে সেই প্রকার অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অমাত্য ও অনুজীবিগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্ব স্ব পদমর্যাদার অনুরূপ প্রাসাদ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।]

(ঝ) ৫।৬৪ শ্লোকে সেই ভবনে অজ রাত্রি যাপন করিতেছেন, তাহার বর্ণনা। পরের দিন স্বয়ংবর। সাভিলাষ অজের কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছে না। শেষে বহুবিলম্বে আসিল।

ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ
নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব॥ —রঘু ৫।৬৪

রজনীতে মিলনলিপ্সু স্বামীর অভিলাষ বুঝিতে অক্ষমা দয়িতা যেমন ধীরে ধীরে নয়নপথবর্তিনী হয় সেই রকম।

এই উপমা কথার খেলা নয়, ভাবকে অনুপম সৌন্দর্যে ইহা মণ্ডিত করিয়াছে। কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত বজ্রসেনের সম্মুখে দীপহস্তে শ্যামার প্রবেশ রবীন্দ্রনাথ একটি উপমায় বর্ণনা করিতেছেন,—

"বিকারের বিভীষিকা রজনীর 'পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র ঊষা সম"—
—পরিশোধ, কথা ও কাহিনী

এই উভয় উদাহরণে যাহা abstract ও concrete তাহা উপমান-উপমেয়ে বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়াছে।

(ঞ) বশিষ্ঠের পাটলবর্ণা ধেনু নন্দিনী আশ্রমে ফিরিয়া

আসিতেছে, সম্মুখে প্রত্যুদ্‌গামিনী রাজ্ঞী সুদক্ষিণা ও পশ্চাতে মহারাজ দিলীপ,—যেন দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তিনী সন্ধ্যা।

পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন
প্রত্যুদ্‌গতা পার্থিবধর্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু-
র্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা॥ —রঘু ২।২০

পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতায়

"সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে।"

(ট) সীতার পুত্রদ্বয়ের সহিত সীতাকে নিয়া রামের নিকট মহর্ষি বাল্মীকি উপস্থিত হইলেন,

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥

[সীতার দুই পুত্র ও উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতসমন্বিতা সাবিত্রী-স্বরূপা সীতাকে নিয়া মুনি উদীয়মানসবিতৃ-সদৃশ রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন।]

রবীন্দ্রনাথের নিকট হিমালয় সবিতৃ-পন্থানুসারিণী অনুদাত্ত-উদাত্ত-স্বরিত-সমন্বিতা ঋক্-এর উদ্‌গাতা,—

হে নিস্তব্ধ গিরিবর, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে।
—উৎসর্গের ২৪ নং কবিতা

কালিদাসের কাব্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে অনায়াসে তাঁহার কাব্য হইতে এই প্রকার অজস্র উদাহরণ সংকলন

করা যাইতে পারে। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের বক্তব্য বিশদ করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ হইতে অর্থগত সামঞ্জস্যপূর্ণ কবিতার পংক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করাও এই প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন; অনেকস্থলে উহা স্থূল ও বিভ্রান্তিকর।

(ঠ) কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে একটি প্রচ্ছন্ন উপমা লক্ষিত হইতেছে।

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ
পয়োধরোৎসেধনিপাতচূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে
চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥

—কুমার ৫।২৪

[প্রথম বর্ষার বারিবিন্দুগুলি তাহার নয়ন-পক্ষ্মে কিছুকাল স্থিতিলাভ করিয়া অবশেষে অধরপুটে বহিয়া আসিয়া আঘাত করিত ও সেখান হইতে গড়াইয়া পড়িয়া পয়োধর-কাঠিন্যহেতু সংঘাতের ফলে বিচূর্ণিত হইত এবং তাহার পরে উদরতটের বলীরেখানিচয়ের মধ্যে স্খলিত হইয়া অবশেষে ধীরে ধীরে নাভিরন্ধ্রে গিয়া আশ্রয় পাইত।]

পর্বতকন্যা উমা যেন একটি গিরিশৃঙ্গ। প্রথম বর্ষার ক্ষীণ ধারা যেমন ধীরে ধীরে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরিশৃঙ্গের শীর্ষদেশ হইতে নিম্নদেশে বহিয়া আসে, মহাকবি যেন তাহারই বর্ণনা গিরিরাজ-কন্যা উমার দেহ অবলম্বনে করিলেন।

রবীন্দ্রকাব্যে নারীদেহের বিস্তারিত বর্ণনা রূপকথা বা পুরাণাশ্রিত কাহিনী ব্যতীত আর বিশেষ কোথাও নাই। চিত্রাঙ্গদা কাব্যে চিত্রাঙ্গদার বর্ণনা পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। পার্থক্যের মধ্যে

এই যে কালিদাসের শ্লোকটি নিরলঙ্কার, চিত্রাঙ্গদা-কাব্যে চিত্রাঙ্গদার পুষ্পজীবন একটি উৎপ্রেক্ষার আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি'—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণশোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।

অথবা

"যেন আমি ধরাতলে—
একদিন উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল, একটি প্রভাত
শুধু পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে
হবে, ভ্রমর-গুঞ্জন-গীতি বসন্তের
আনন্দ মর্মর, তার পরে নীলাম্বর
হ'তে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
বায়ু স্পর্শভরে টুটিয়া লুটিয়া যাব
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীটুকু আদিঅন্তহারা।"

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে ইহাকে 'পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুম কাহিনী' বলিয়াছেন।

উদ্ধৃত উদাহরণ সমূহ হইতে আমাদের প্রস্তাবিত এই সিদ্ধান্তে যদি আমরা উপনীত হইতে পারি যে সূক্ষ্ম কল্পনাসাধ্য অনুভববেদ্য

জগতের সহিত কালিদাস প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতের সম্পর্ক উপমার সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরূপ উপমা-প্রয়োগের জন্য শেলির নিকট হইতে ঋণ-গ্রহণ আর অবশ্য-স্বীকার্য থাকে না।

প্রকৃত পক্ষে শেলির কাব্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রথম পর্বে যদি কোন সার্থক প্রেরণা যোগাইয়া থাকে তবে তাহা রোম্যান্টিক কবিতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিচিত্তের ভাবাবেগের উচ্ছ্বলতা।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কালিদাস ব্যতীত আর কোন ভারতীয় কবি অলঙ্কার-প্রয়োগে এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অবশ্য অলঙ্কার যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন কথা আমরা বলিতেছি না এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অলঙ্কারের উপরই আপন কাব্যত্বের জন্য নির্ভরশীল তাহাও নয়। উপমা-প্রয়োগে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য নির্দেশ করা এবং রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর একান্ত প্রিয় কবি কালিদাস ব্যতীত এ স্থলে অপর কোন কবি অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া এইক্ষেত্রে কালিদাসীয় প্রভাব স্বাভাবিক মনে করা যে সঙ্গত ইহা নির্দেশ করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ—কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার প্রয়াস আছে। তাহার শান্ত ও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে, তাহার ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যের মধ্যে, সমুদ্রে-পর্বতে, অরণ্যে-উদ্যানে, জীবনের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ জয়-পরাজয়ের পটভূমিতে তাহাকে মহাকবি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তির বর্ণনা আছে, দাবানল-বর্ণনা আছে, পর্বতের রুক্ষ গম্ভীর বিরাট্ত্বের অনুচিন্তন আছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যে যাহা সুললিত, যাহা করুণ-কোমল, যাহা প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ-গম্ভীর তাহারই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার হিমালয়-বর্ণনায় বিরাট্ দেবতাত্মার প্রকাশ নাই, তাঁহার কার্তিকেয়-জননীর বয়ঃসন্ধিবর্ণনা যেন যে-কোন লৌকিক নায়িকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনারই অনুরূপ, তাঁহার দণ্ডকারণ্য যেন উপবনশোভা ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরই অনুরূপ। মানবচিত্তে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত হইতে গভীর ভগবৎপ্রেম পর্যন্ত বিচিত্র অনুভূতি ও বহির্বিশ্বের নদ-নদী-সমুদ্র-অরণ্য-প্রান্তর-নগর-পল্লীর বিরাট চিত্রশালা রবীন্দ্রকাব্যে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশমান। তথাপি আধ্যাত্মিক অনুভূতি অপেক্ষা জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও প্রকৃতিতে বাস্তব ভীষণতা অপেক্ষা মাধুর্য ও রমণীয়তা সাধারণতঃ তাঁহার কাব্যে প্রকাশমান। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে বলিতে পারেন যে 'বৈশাখ' কবিতা বা

'দেবতার গ্রাস' কবিতার অংশ-বিশেষ ইহার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বহন করে। আমাদের বক্তব্য এই উহা তাঁহার কবিতার স্বধর্ম নয়, ব্যতিক্রম। এই দিক হইতে কালিদাসের সহিত তাঁহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য অনুকরণমূলক নয়, চিত্তের স্বাভাবিক গঠনেই এই সাদৃশ্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক গঠন অনুসারেই যাহা মৃদু, স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত তাহার প্রতি অনুরাগী।

এই কারণেই এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি স্বাভাবিক কারণেই পরস্পরের মানস প্রকৃতি এক প্রকার হয় তবে একের উপর অপরের প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে কেন? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর ভূমিকায়ই দিয়াছি। এই প্রভাব সমানধর্মার প্রতি অনুরাগ হইতে উৎপন্ন এবং অপরাপর ক্ষেত্রে প্রভাবের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তের এই বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস তাহার কৈশোর জীবনের ইতিবৃত্ত হইতে প্রথম ধরা পড়ে। কুমারসম্ভবের সহিত কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের অধ্যায় এইভাবে জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

> "মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকরাণাং
> বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ।
> যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
> রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥'

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছু বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিত দেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল।

সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণতৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।" কবি-চিত্তের এই সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা সমস্ত জীবন তাঁহার কাব্যের উপর আপন চিহ্ন মুদ্রিত রাখিয়া গিয়াছে, রুক্ষ পুরুষ ভয়ঙ্করের যে সৌন্দর্য তাহার আবিষ্কারের পথে বাধা হইয়াছে। কবি নিজে যে এবিষয়ে একেবারেই অনবহিত ছিলেন এমন নয়। জীবনের শেষ অধ্যায়ে রচিত 'নবজাতক' কাব্যে বিগত দিনের কাব্যসৃষ্টির দিকে তাকাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই,

—রূপ-বিরূপ

রবীন্দ্রনাথের রচনায় গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর যাহা কিছু সকলই স্নিগ্ধ ললিত প্রশান্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। কালিদাসের কাব্য সম্পর্কেও ওই কথা, ঋতুসংহারের গ্রীষ্মবর্ণনায় গ্রীষ্মের বাস্তবতা অপেক্ষা তাহার রম্য (aesthetic) রূপটিই যেন অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কবি যখন দাবাগ্নি বর্ণনা করিতেছেন তখন বনভূমির কেমন চিত্র সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে ?

বিকচ-নবকুসুম্ভ-স্বচ্ছ-সিন্দুরভাসা
প্রবল-পবন-বেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন
দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥

—গ্রীষ্মবর্ণন ২৪

[নব-বিকসিত কুসুম্ভ কুসুম ও স্বচ্ছ সিন্দূরের ন্যায় দীপ্তিমান প্রবলবেগসম্পন্ন পবনের দ্বারা দ্রুতধাবন অগ্নি বৃক্ষশাখার ও লতিকারাজির শীর্ষভাগে পরস্পরের আলিঙ্গন ব্যাকুলতা জাগাইয়া চকিতে চারিদিকের ভূভাগ দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।]

কবি যখন দাবাগ্নি বর্ণনা করিতেছেন সেখানেও কবির লক্ষ্য তরুলতার আলিঙ্গন-চিত্রের প্রতি।

ছয় ঋতুরই আসন রবীন্দ্রকাব্যে আস্তৃত থাকিলেও বর্ষার কবি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত হইয়া থাকেন। গীতাঞ্জলির বর্ষার গানগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অপরাপর কাব্য হইতে বর্ষার বিশিষ্ট কবিতাগুলি সংকলন করিতে হইলে প্রথমেই 'মানসী'র 'বর্ষার দিনে', 'কল্পনা'র 'বর্ষামঙ্গল' ও 'ঝড়ের দিনে', ক্ষণিকার 'আষাঢ়' 'নববর্ষা' 'অবিনয়' 'আবির্ভাব' প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। কবিতাগুলির প্রত্যেকটি সুন্দর এবং অনেকগুলিতে কালিদাসের কাব্যের উপকরণ নিয়া সেকালের আবহাওয়া ঘনাইয়া তুলিবার প্রয়াস এত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে কালিদাসের ঋতুসংহার-মেঘদূতের প্রভাব যে সেগুলির উপরে রহিয়াছে তাহার স্বীকৃতি সাক্ষ্য-প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু সব কবিতা একত্র করিলেও বর্ষার সমগ্র বাস্তব রূপ তাহাদের মধ্যে ধরা পড়ে নাই। কবির বর্ষা-চিত্রে আমরা শুধু দেখি

"কূল ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।"

কিন্তু কূল প্লাবিত করিয়া, বৃক্ষরাজিকে উন্মূলিত করিয়া, নরনারীর শত সহস্র কুটীর-প্রাসাদ বিধ্বস্ত করিয়া তীব্র খরস্রোতে ভাসাইয়া নিয়া বর্ষার নদী রবীন্দ্রকাব্যে কোথাও বহিয়া চলে নাই। সত্য বটে "ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে" কিন্তু শুধু "নব মালতীর কচি দলগুলি" সেই বর্ষণের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে মাত্র এবং সকল কিছু ছাপাইয়া তরুণী বর্ষা-সুন্দরীর যে-রূপ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মনোহরণ, এবং কবি-হৃদয় মেঘদর্শনে ময়ূরের ন্যায় নাচিয়া উঠিয়াছে। এ-পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিয়া যাইবার মতো মেঘোদয় এ নয়, এ-মেঘকে কাজল করিয়া চোখে পরা চলে। অথবা এ-মেঘ বর্ষা-সুন্দরীর বিমুক্ত কেশপাশ; বিদ্যুৎশিখার বিকাশে প্রাসাদ-শিখরে তাহার লুকোচুরি ধরা পড়িতেছে। ঘাটে আনমনে বসিয়া যে-তরুণী "নবমালতীর কচিদলগুলি" দাঁতে কাটিতেছে—কলসী ভাসিয়া যাইতেছে সেদিকে খেয়াল নাই—সেই স্নিগ্ধকান্তি বর্ষাসুন্দরীই কবির মন ভুলাইয়াছে। ঝড়ের প্রহারে বকুল-শাখার আর্তনাদ নয়, যে-দোলায় বর্ষাসুন্দরী দুলিতেছে তাহার আন্দোলনের ফলে বকুলের শাখায় যে মর্মর জাগিয়াছে তাহাই কবির কানে বাজিয়াছে। যে-কবি পদ্মার প্রলয়ঙ্কর রূপের সহিত সুপরিচিত তিনি কাব্য-রচনাকালে আপনার সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি অভিনিবেশের ফলে প্রকৃতির স্নিগ্ধতর প্রকাশকেই অভিনন্দিত করিয়াছেন।

কালিদাসের দৃষ্টি এ বিষয়ে কী রকম?

"বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং
ভুজঙ্গবদ্বক্রগতি-প্রসর্পিতম্।

সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং
প্রয়াতি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্ ॥
—বর্ষাবর্ণন ১৩, ঋতুসংহার

[নানাবিধ জলকীটধূলিতৃণাদিমিশ্র পঙ্কিল-পাণ্ডুর, সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে নিম্নাভিমুখে প্রবহমাণ নবীন স্রোতোধারাকে ভেককুল সন্ত্রস্ত হইয়া দর্শন করিতেছে।]

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টাইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥

[প্রবল সলিলসংঘাতের বেগে উভয় তীরবর্তী বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া কুলভ্রষ্ট কামিনীর ন্যায় বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নদীগুলি ত্বরিতবেগে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়াছে।]

এই উভয় শ্লোকেই ভয়ঙ্করকে আপন কাব্যরুচি-অনুযায়ী রম্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। প্রথম শ্লোকটিতে যে ভয়াবহতা কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কাব্যসুলভ রম্য ভয়ই তাহার স্বরূপ, বাস্তব দৃষ্টি এখানে প্রবল নয়; গ্রীষ্ম-বর্ণনায়ও কবি প্রখর রৌদ্রতাপে সাপের ফণায় ভেককে আশ্রয় দিয়াছেন, সর্প সেখানে ময়ূরের পুচ্ছের মধ্যে রৌদ্রক্লান্ত হইয়া মুখ লুকাইয়া আছে।

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে কবির উপমাটি তাঁহার কাব্যে বাস্তবতা অপেক্ষা বিলাসের প্রতি উন্মুখতাকে পরিব্যক্ত করিতেছে। বর্ষা যুগপৎ ভয়ঙ্করী ও বিলাসিনীরূপে এখানে দেখা দিলেও বিলাসিনীর চিত্র অঙ্কনে কবির স্বভাবসুলভ দক্ষতা বলিয়া এখানেও তাহারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব যেখানে গম্ভীর এবং ভীষণ-সুন্দরের উপস্থাপনা যেখানে কবির ঈপ্সিত সেখানেও শেষ পর্যন্ত মধুরেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দিগম্বর রুদ্র সন্ন্যাসীর বেশে মোহনাশন নব-জীবনের আবির্ভাব কল্পনার মধ্যে যে বিরাট্ত্বের প্রকাশ তাহা কবির বর্ণনার মধ্যে ধরা পড়ে নাই, ললিত-মধুর শব্দ-চয়নে ও কবির সৌন্দর্যাতুর দৃষ্টির ফলে যিনি ভয়ঙ্কর তিনি নয়নাভিরাম হইয়া উঠিয়াছেন।

"এস গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীষণ শোভন ॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্ত-পাবন ॥
থাক বীণাবেণু, মালতী-মালিকা, পূর্ণিমানিশি-মায়া-কুহেলিকা—
এসো গো প্রখরহোমানল-শিখা হৃদয়-শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়, আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়—
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণ-সাধন ॥"

'হৃদয়-শোণিত-প্রাশন' পর্যন্ত যাহাকে বলা হইয়াছে তাহার এই আগমনীতে কোথাও ভীতিচ্ছায়া আছে. কি? কবির সহজ প্রকৃতিই তাহাকে করুণ-কোমল ললিত-সুন্দরের প্রতি অভিনিবিষ্ট করিয়াছে। ইহা এক প্রকার কাব্য-বিলাস।"

কাব্য-বিলাস

কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি উক্তি আছে,— একটি 'সাহিত্য'-গ্রন্থের 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে, অপরটি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে। প্রথমটিতে

তিনি বলিয়াছেন, "কালিদাস সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহাও এইরূপ অর্থাৎ বাল্মীকি, কবি-কঙ্কণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত গল্পের অনুরূপ। তিনি মূর্খ, অরসিক, বিদুষী স্ত্রীর পরিহাস-ভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন এই উভয়ের একই তাৎপর্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টা মাত্র। এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।"

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "কালিদাস একান্তই সৌন্দর্য-সম্ভোগের কবি, এমত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পগুলি জনসাধারণ কর্তৃক কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।"

এই উভয় প্রবন্ধেরই রচনাকাল প্রায় এক—১৩০৮ সাল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিতে জনমতের মূলে যে সূক্ষ্ম সত্য বিদ্যমান তাহা রবীন্দ্রনাথ অনেকটা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য যেন অনেকটা এই রকম, এই গল্পগুলি যদিচ মিথ্যা, তথাপি ইহাদের ভিতরের কথাটি মিথ্যা নয়; দৈবানুগ্রহ ব্যতীত এতখানি কবিত্ব সম্ভবে না, অর্থাৎ কালিদাসের কবিত্ব অপরিমেয়। অতএব এই লোকপ্রচলিত গল্পগুলির নিজস্ব মূল্য আছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি জনমতকে একেবারেই উড়াইয়া

দিয়াছেন। কালিদাস সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছিয়াছেন তাহা এই, "………কালিদাসের সৌন্দর্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগ-বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম ও কর্মবৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য-ভোগের ও ভোগ-বিরাগের কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'সৌন্দর্য-ভোগ' 'সৌন্দর্য-বিলাস', 'রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা' বলিয়াছেন তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহা কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যে সমানভাবে রহিয়াছে। উভয় কবির কাব্যে সমানধর্মের যে কয়েকটি লক্ষণ আছে ইহা তাহাদের অন্যতম।

কাব্যে এই "রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্য" ভাষা ও ভাব উভয়কেই আশ্রয় করিতে পারে। ভাষা ও ভাবের ঐকান্তিক প্রসাধন-পারিপাট্য, এবং রম্যতার অনুরোধে বাস্তবতার আদর্শ হইতে চ্যুতি—ইহাকেই কাব্যে ভাষা ও ভাবের বিলাস নামে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা কালিদাসের কাব্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। শৃঙ্গারের অবাঞ্ছিত প্রকাশ কোথাও উদ্দিষ্ট বীররসের, কোথাও বা করুণরসের সৃষ্টির পথে অন্তরায় হইয়াছে।

(ক) মহারাজ দিলীপের শততম অশ্বমেধের অশ্বটি দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, কুমার রঘু তাঁহাকে বাধা দিলেন। এইবার কালিদাস উভয়ের যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন।

হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ
সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।

ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে
স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্ ॥

[ঐরাবতকে তাড়নার ফলে কর্কশ এবং শচীর অঙ্গের পত্রলেখাবিশেষের দাগ (আলিঙ্গনের ফলে) যে হাতে আঁকা ছিল ইন্দ্রের সেই হাতখানিতে কার্তিকেয়তুল্য শক্তিমান কুমার নিজের নাম-লেখা বাণে বিদ্ধ করিলেন।]

ইন্দ্রের হাতখানির যে দুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রথমটি 'সুরদ্বিপাস্ফালন-কর্কশাঙ্গুলৌ' সুপ্রযুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয়টির যাহা কিছু সৌন্দর্য তাহা অস্থানে প্রয়োগের ফলে ব্যর্থ। অস্থানে বলিতেছি এই কারণে যে যুদ্ধবর্ণনায় বীর-হস্তের পক্ষে এ বিশেষণটি অবান্তর। এই জাতীয় বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায় :—

অথ স ললিত-যোষিদ্‌ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং
রতিবলয়-পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ২।৬৪

রতিবল্লভ কুসুমশর মন্মথ, যখন পশুপতিকে কামমোহিত করিবার প্রয়াসে বসন্তকে সহায় করিয়া যাত্রা করিয়াছেন তখন "পুষ্পধন্বা"র 'কণ্ঠে'র বিশেষণরূপে "রতিবলয়পদাঙ্কে" শব্দটি যে স্বাভাবিক ও সুন্দর এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না।

ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধের বর্ণনা বাক্যবাণ, লৌহময় বাণ ও শেষ পর্যন্ত বজ্রের নিক্ষেপ সব মিলিয়া প্রায় কুড়িটা শ্লোকে চলিয়াছে। অথচ কবি যখন লিখিতেছেন,

"বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণো-
রধোমুখৈরূর্ধ্বমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥"

তখন পাঠকের মনে হয় যেন যুযুধান বীরদ্বয় পরস্পরকে ফুল ছুঁড়িয়া মারিতেছেন।

(খ) ইন্দ্রমতীকে বিবাহ করিয়া সপত্নীক অজ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন। পথে স্বয়ংবর সভার প্রত্যাখ্যাত রাজারা সম্মিলিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমুল যুদ্ধ হইল, অজ জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অজ শঙ্খ নাদ করিতেছেন,

"ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে
নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ
পিবন্ যশো মূর্তমিবাবভাসে ॥"

[অতঃপর কুমার প্রিয়া-পরিভুক্ত অধরোষ্ঠে শঙ্খ স্থাপন করিয়া বাজাইলেন। তাহাতে মনে হইল, বীরশ্রেষ্ঠ স্বহস্ত-অর্জিত মূর্তিমান যশোরাশিই পান করিতেছেন।]

রণভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধে যে বীর শঙ্খনাদ করিতেছেন তাহার অধরোষ্ঠ-রস যে প্রিয়া-পরিভুক্ত এ সংবাদটি কবি না জানাইয়া স্বস্তি পাইতেছেন না।

উক্ত সংগ্রামের বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন,

'কশ্চিদ্-দ্বিষৎ-খড়্গ-হৃতোত্তমাঙ্গঃ
সদ্যো বিমান-প্রভুতামুপেত্য।
বামাঙ্গ-সংসক্ত-সুরাঙ্গনঃ স্বং
নৃত্যৎকবন্ধং সমরে দদর্শ ॥' —রঘু ৭।৫১

[খড়্গাঘাতে খণ্ডিত-শীর্ষ কোন বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ দেবযান প্রাপ্ত হইয়া এক সুরাঙ্গনাকে বামাঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্যপর আপনার মস্তকহীন দেহকে দেখিতে পাইলেন।]

অনুরূপ আর একটি শ্লোক—

"পরস্পরেণ ক্ষত্রয়োঃ প্রহর্তো-
রুৎক্রান্তবায়্বোঃ সমকালমেব।
অমর্ত্যভাবেঽপি কয়োশ্চিদাসী-
দেকাপ্সরঃ-প্রার্থিতয়োর্বিবাদঃ॥ —রঘু ৭।৫৩

[কোন যোদ্ধৃযুগল পরস্পরকর্তৃক নিহত হইলেও দেবত্বপ্রাপ্তির পর এ জন্মের শত্রুতার পালা শেষ হইলেও একটি অপ্সরার উভয়েই প্রার্থী হওয়ায় দেবলোকে আবার নূতন করিয়া তাহাদের বিবাদ বাধিল।]

একান্ত অবান্তর হইলেও আদিরসপ্রসঙ্গ কিছু না হইলে কবির যেন ক্লান্তি আসে। সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য তাই তিনি বারে বারে ব্যভিচারী হিসাবে শৃঙ্গারের উপস্থাপনাদ্বারা উক্ত 'রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যে'র পরিচয় দিয়া থাকেন।

যেমন শৃঙ্গারের অবান্তর উপস্থাপনা এখানে রসভঙ্গ করিতে চায় তেমনি কুমারের চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপে করুণ-রসসৃষ্টিতে উক্ত 'রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্য' অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অজ-বিলাপে যে ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে রতি-বিলাপের ছন্দও সেই 'বিয়োগিনী,' দম্পতীর একজনের মৃত্যুতে অপরের বিলাপ এখানে-ও বিষয়বস্তু; তথাপি শোকের যে গভীরতার প্রকাশ অজ-বিলাপে লক্ষিত হয় রতিবিলাপে তাহা বিরল। পতি-বিয়োগিনীর হাহাকার রতি-বিলাপে বাজিয়া ওঠে নাই।

"বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী"[১] বিশেষণটির এবং 'স্তনসংবাধমুরো জঘান চ'[২]—ইত্যাদি চরণে 'স্তনসংবাধম্' ক্রিয়া-বিশেষণটির প্রয়োগে

১। কুমার ৪।৪
২। ঐ ৪।২৬

এই রস-বিলাসেরই কিয়ৎ পরিমাণ আভাস লক্ষিত হয়, কিন্তু নিম্নলিখিত চরণে শোকের গভীরতা সবিশেষ বিঘ্নিত হইয়াছে,

'অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা
পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ
প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ৪।২০

[চতুর সুরকামিনীরা তোমাকে স্বর্গে প্রলুব্ধ করিবার পূর্বেই চিতাগ্নি-পথ অবলম্বন করিয়া আমি দ্রুত গিয়া তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব।]

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে যাহার মুখে কবি এই উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন সে কামপ্রিয়া,—সাবিত্রী নয়, তথাপি শ্লোকটির প্রথম দুই চরণে যে ভাবলোক সৃষ্টির অবকাশ ছিল পরবর্তী দুই চরণে তাহার প্রতি কবি একান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সর্গের চতুর্থ শ্লোকের উক্ত বিশেষণটির সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। শ্লোকে সৌন্দর্য-সৃষ্টির পক্ষে ইহা অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না, এ বর্ণনা বাস্তবানুগ বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে। আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে কবির সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস যে এই করুণরসের চিত্রখানি অঙ্কনের ব্যাপারেও আপন স্বভাবসিদ্ধ রীতি পরিহার করে নাই, ইহাই বলিতে চাই। বিশেষ করিয়া প্রত্যেক সাহিত্যেরই যে নিজস্ব একটি প্রকৃতি আছে তাহা সাহিত্য-সমালোচনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং এ বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের আপন বৈশিষ্ট্যে লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাসের নয় এমন দুইটি শ্লোক আমরা এ বিষয়ে উদাহরণরূপে সংকলন করিতেছি।

দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥

[যে ব্যক্তি অপরিমিতব্যয়ী পরিমিতধন তাহাকে পর্যাকুল করে, তাহার কোন দিকই কুলায় না, যাহার স্তন ও জঘনদেশ স্থূল এমন মহিলাকে ক্ষুদ্র পরিধেয়বসন যেমন পর্যাকুল করে, তাহার যেমন কোন দিকেই কুলায় না।]

এই শ্লোকের মূল বক্তব্য প্রথম দুই চরণে প্রকাশ পাইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের উপমাটি একান্তভাবেই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বাংলা কাব্যে শুধু উপমা প্রয়োগের জন্য অনুরূপ পংক্তি রচিত হয় না।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব॥

[দরিদ্র ব্যক্তিদের মনোবাঞ্ছা বালবিধবা কুলাঙ্গনাদের স্তনদ্বয়ের ন্যায় হৃদয়ে জাগিয়াই লয় প্রাপ্ত হয়।]

প্রথমোক্ত শ্লোক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা এই স্থলেও সমানভাবে প্রযোজ্য কিন্তু ২৬ নং শ্লোকের ক্রিয়াবিশেষণটির পূর্ব কথিত প্রয়োজন ব্যতীত অপর কোন প্রয়োজন ছিল না। আসল কথা এই যে কালিদাসের কাছে রতি-বিলাপে পতি-বিয়োগিনীর শোক বড় হইয়া দেখা দেয় নাই; ইহা যে সুন্দরী নারীর শোক এই কথাটাই কাব্যে বড় করিয়া তোলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে অনুরূপ একটি বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা কোথায় দেখা যাক—

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতিবাদিনী
চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা।

স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ

সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ ॥ —কুমার ৫।৮৪

[অথবা বৃথা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি—এই বলিতে বলিতে গমনোদ্যতা পার্বতীর দ্রুতগতি-বশে স্তনাবরণবল্কল স্খলিত হইয়া পড়িল এবং বৃষধ্বজ শঙ্করও স্বীয় রূপ পরিগ্রহ পূর্বক স্মিতহাস্যে তাঁহাকে ধারণ করিলেন।]

ব্রহ্মচারীর শিবদূষণ বাক্য অসহ বোধে আরাধ্য-দেবগতচিত্তা পার্বতীর স্থান-ত্যাগের প্রয়াসে ঐকান্তিকী ভক্তি ও পরিমার্জিত রুচি, সুদীর্ঘ তপশ্চরণের ফলপ্রাপ্তি ও প্রিয়মিলনের মাধুর্য এই চিত্রখানির মধ্যে একত্র সঞ্চিত হইয়াছে। 'স্তনভিন্ন-বল্কলা' বিশেষণটি এখানে মিলনকে উজ্জ্বল করিয়াছে। বিশেষতঃ কবির শব্দ-প্রয়োগে সংযম এখানে সবিশেষ লক্ষণীয়। কুমারসম্ভবে মদন-ভস্মের ও রঘুবংশে সীতার পাতাল-প্রবেশের বর্ণনায় কবির যে বাক্‌সংযম বহুপ্রশংসিত এখানেও সেই বাক্‌সংযমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রতি-বিলাপ সম্পর্কে আমাদের সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে রতি-বিলাপে শোকের বুকফাটা প্রকাশ কোথাও নাই।

শুধু আলোচ্য অংশে কেন, গভীর অনুভূতির ঐকান্তিক প্রকাশ সংস্কৃত কাব্যে বিরল। অসহ শোক, মহৎ ভয়, প্রাণখোলা হাসি, সংস্কৃত কাব্যে দুর্লভ। নিটোল ছাঁদে, নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যে, যাহা কিছু রুক্ষ বন্ধুর তাহাকে সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ করিয়া, অলঙ্কৃত নিখুঁত-পারিপাট্য-পূর্ণ ভাষার বাঁধনে তাহাকে রম্য উপহারযোগ্য করিয়া সংস্কৃত কবিরা পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মানবচিত্তের সহজ আদিম ভাবসমূহ তাহার ফলে তাহাদের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা হারাইয়া এক উপভোগযোগ্য রসপরিণাম লাভ করিয়াছে মাত্র। কবির কাব্য-

লোকের অধিবাসী নরনারীগণ সমশ্রেণীর চরিত্রগুলির ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, কাহাকেও পৃথক করিয়া সহজে চোখে পড়ে না; কাহারও ব্যক্তিত্ব সুচিহ্নিত নয়। নায়কেরা সকলেই সমান গুণশালী, রাজোচিত শক্তির অনিন্দ্য আধার; নায়িকারা সকলেই সুন্দরী যুবতী। ফলে কাব্য কেবল নিস্তরঙ্গ রসসরোবরে প্রসন্ন শতদলের মত শোভা পাইয়াছে, জীবনের শত সহস্র দুঃখদাহ-সমস্যা-সংশয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা একটি দলকেও শীর্ণ ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে নাই।[১] অবশ্য পারত্রিক জীবনে তৎকালোচিত বিশ্বাস-ও ঐহিক জীবনের বিক্ষোভকে সেখানে সংযত করিয়াছে। ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া কাব্য-রচনার ব্যাপারে সে-যুগের কাব্যের সাধারণ ধর্ম যে সহায়তা করিয়াছে এ কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাস্তব পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার ধূলি-ধূম-মালিন্যের লেশমাত্র সঞ্চয়কে উপেক্ষা করিয়া, বর্জন করিয়া, কাব্য রচনার ব্যাপারে যে রোম্যান্টিক মানসের প্রকাশ আছে[২] রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র তাহার পরিচয়

১। "………the world of poetry, where the hard and harsh facts of life dissolve themselves into an imaginative system of pleasing fictions. If results in an impersonalised and ineffable asethetic enjoyment from which every trace of component or material is obliterated. In other words, love or grief is no longer experienced as love or grief in its disturbing poignancy, but as pure artistic sentiment of blissful relish evoked by the idealised poetic creation. —Hist. of Sans. Lit:

—Das Gupta and De P. 37.

২। (ক) তুলনীয়

"তবু কি ছিল না তব সুখ-দুঃখ যত
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা-ষড়চক্র, আঘাত গোপন।

মিলিবে।[১] এই কাব্য-বিলাস রবীন্দ্রনাথের রচনায় শব্দ-প্রয়োগে,

কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্যপানে, তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান॥

—কাব্য, চৈতালি।

(খ) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের শেষে ভরত-বাক্যের একটি শ্লোকে কবির জীবনালেখ্য অতি সূক্ষ্মভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি লিখিতেছেন,

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদ্দ্ভূতয়ে সতাম্॥

[সজ্জনদিগের সর্বপ্রকার অভ্যুন্নতির জন্য চিরকাল পরস্পর-বিরোধিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিরোধ মিটিয়া যাউক ও তাঁহাদের যে মিলন অতি দুর্ঘট তাহা সাধিত হউক।]

কেহ কেহ এই শ্লোকটিতে কবির ব্যক্তিজীবনে দারিদ্র্য ও রাজপ্রসাদ-প্রার্থনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন।

১। (ক) আপন কাব্য-সৃষ্টির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি,—
লজ্জা দিয়ো না।

চিত্র-কল্পনায় ও ভাবের উপস্থাপনায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই তিনটি আমরা একে একে পরীক্ষা কা্িব।

(ক) শব্দ-চয়ন ঃ—

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গানের মধ্যে মানবচিত্তের যে-কোন ভাব ও বহিঃপ্রকৃতির যে-কোন রূপ খুঁজিতে গেলে একেবারে নিরাশ হইয়া যে ফিরিতে হইবে না এ আশ্বাস অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি কাব্যসৃষ্টির সেই রাজকীয়

সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
... ...
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে আমার আপন ব্যথা।"

—বিশ্বশোক, পুনশ্চ।

(খ) "এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে-পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বারবার।

—অনসূয়া, সানাই।

আয়োজনের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বেশি চোখে পড়ে, ও অনেক সময় ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হয়, তাহা কতগুলি বাঁধা শব্দের আবৃত্তি। টমসন সাহেব ইহাদের একটা তালিকা করিয়াছিলেন।[১] এই তালিকার মধ্যে সীমা, অসীম, অনন্ত, আনন্দ, রথ, পথ, রাজা প্রভৃতি অনুরূপ বহু শব্দের উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলির কোনটি কতবার তাঁহার কাব্যে দেখা দিয়াছে অথবা কোন্ কবিতায় ইহাদের কোন্‌টির প্রয়োগ অবাঞ্ছিত রূপে ঘটিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে আমরা ব্যাপৃত হইব না। আমাদের বক্তব্য এই যে কাব্যের বহিরঙ্গ প্রকৃতি ও পরিবেশ (atmosphere) রচনায় এবং হৃদয়ের অনুভূতি লইয়া বিলাসে এই শব্দ সম্ভারের দ্বারা পরিপুষ্টি সাধন সহজেই চোখে পড়ে এবং এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবকেই স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত। এই শব্দ-প্রয়োগের সহিত অলঙ্কার-প্রয়োগকেও আমরা মিলাইয়া দেখিতেছি, ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য। টমসন লিখিতেছেন, "Even

১। There is a recurrence of a certain vocubulary, of flowers, south wind, spring, autumn, tears, laughter, separation, tunes, bees, and the rest, which sometimes is positively maddenning. This sort of thing is most apparent when he is least inspired, but it is by no means absent from his best work......Moon, spring, sigh, eternal separation, night and full moon, laughter, flute, unrest, tears, weeping, Hope...these are the old performers, none absent. There is many a passage in Rabindranath when you might call the roll, and if one of these were present, all the rest would click their heels and answer.

—ঐ পৃঃ ৭০—৭১

in much of the noblest work of his later years, his incorrigible playfulness, the way in which, often when most serious, he will fondle and toss with fancies, spoils some splendid things. In his lectures and addresses he can never resist the temptation of a glittering simile. Often he dazzles the beholder with beauty when he wishes most to convince. When he should run a straight course, he turns aside."

কাব্য-সৃষ্টিতে এই শব্দরাজির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ সংস্কৃত কাব্যের শব্দভাণ্ডারের ও প্রয়োগ-রীতির সহিত পরিচয়ের ফল। কাব্যে প্রাচীনেরা এই জাতীয় শব্দরাজির নিরঙ্কুশ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহারা আসিয়া রবীন্দ্রকাব্যে আসর জমাইয়াছে। বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যে সুষম, ললিতাক্ষর, শ্রুতিসুখকর শব্দের অকৃপণ দাক্ষিণ্য লোকপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের কাব্যে ভবভূতির কাব্যের ন্যায় মানুষের রুক্ষপরুষ স্বাভাবিক অনলঙ্কৃত হৃদয়াবেগের প্রকাশ বিরল বলিয়া এই শব্দলালিত্য তাঁহার কাব্যের আনুকূল্য সাধন করিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে পারুষ্যের বর্ণনা অপরিহার্য সেখানে এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগে লক্ষ্য পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভবপর নয় বলিয়া এই পদলালিত্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। মদনভস্মের বর্ণনায় কবির বাক্‌সংযম আমরা প্রশংসা করিয়াছি কিন্তু এখানেও পদলালিত্যের এমন প্রকাশ রহিয়াছে ভবভূতি যাহাকে অবাঞ্ছিত মনে করিতেন।

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥" —কুমার ৩।৭২

['হে প্রভো, আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন,' দেবগণের এই বাক্য আকাশ-পথে যতক্ষণে ভাসিয়া আসিতেছিল সেই সময়ের মধ্যে মহাদেবের তৃতীয়নয়নবহ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিল।]

এ শ্লোকটিতে 'ভব'—শব্দটিতে অনুপ্রাসের আনুকূল্য হইয়াছে বটে কিন্তু 'রুদ্র' বা অন্য কোন পরুষাক্ষর শব্দ অধিকতর সুপ্রযুক্ত হইত।[১]

টমসন যাহাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে "incorrigible playfulness" বলিয়াছেন তাহা সংস্কৃত কাব্য সম্পর্কে বিশেষ করিয়া সত্য, এবং কালিদাসের নিকটেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত-কাব্যের গঠনের বর্ণনার বিলাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

১। এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুশীল কুমার দে লিখিতেছেন,—"In his description of primal sensations Bhavabhuti is as often direct as he is uncouth but terribly appropriate in his selection of words. The word 'gra-van', for instance, in his famous line, describing Rama's poignant sorrow [Uttara, 28], is not like Kalidasa's 'Upala', but it cannot be substituted for a weaker word."

—Hist. of Sans. Lit.

—Das Gupta and De. P. 297

অথেদং রক্ষোভিঃ কনকহরিণচ্ছদ্মবিধিনা
তথাবৃত্তং পাপৈর্ব্যথয়তি যথা ক্ষালিতমপি,
জনস্থানে শূন্যে বিকলকরণৈরার্য-চরিতৈ-
রপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্ ॥

[পাপাত্মা রাক্ষসেরা সুবর্ণময় হরিণের ছলনা করিয়া এমন নৃশংস আচরণ করিয়াছিল যে যদিও তাহার সম্যক প্রতিবিধান করা হইয়াছে, তথাপি উহা

"বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার (সংস্কৃত কাব্যের) গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল; কারণ প্রক্ষেপ সহিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না।.........মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা, কোনটাতেই ত্বরান্বিত হইবার কোন উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক, এখন ঐ বর্ণনাটাই চলুক। রঘুবংশ-ও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ্য মাত্র।"[১]

চিত্র-কল্পনা

সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়ের এবং তদতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের চারুতা-সম্পাদনের প্রতি কবির একাভিনিবেশের ফলে যেমন কেন্দ্রগত ভাব উপেক্ষিত হইয়াছে ও পৃথক পৃথক ভাবে শ্লোকগুলির পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে মাত্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ঠিক অনুরূপ রীতিতে ভাবের উপেক্ষা ও চিত্র-কল্পনার বহুস্থলে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে

(স্মরণ করিলে) যন্ত্রণা উৎপাদন করে। জানকীবিহীন শূন্য জনস্থানে আর্য রামচন্দ্র বিহ্বলেন্দ্রিয় হইয়া যে বিলাপ ও রোদনাদি করিয়াছিলেন, তাহাতে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।]

—বিধুভূষণ গোস্বামী।

কালিদাসীয় কাব্যের তুলনায় লালিত্যহীন ভবভূতির রচনা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে নাই।

১। কাদম্বরী চিত্র, প্রাচীন সাহিত্য।

প্রসঙ্গচ্যুতি বা চিত্র-বিলাসের দ্বারা কবিতার মূল উপজীব্য ভাবের যে অঙ্গহানি হইয়াছে তাহা অসতর্ক মুহূর্তের কাব্যপাঠে ধরা না পড়িতে পারে কারণ পূর্বকথিত শ্রুতিলোভন শব্দরাজির ঐশ্বর্য ও কল্পনার বৈচিত্র্যে তিনি পাঠকের সম্মুখে এক অতি মোহময় স্বপ্ন-কুহেলির যবনিকা রচনা করিয়াছেন।

'কল্পনা' কাব্যের 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতার নায়িকা কালিদাসের কাব্যলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কবিতার বিষয়টি এই যে মিলনার্থী প্রিয়তম বারবার আসিয়া আহ্বান জানাইয়াছে, লজ্জায় বাধিয়াছে বলিয়া মিলনোন্মুখী হইয়াও নায়িকা তখন সাড়া দিতে পারে নাই। আজ মিলনের শুভলগ্ন যখন পার হইয়া গিয়াছে তখন নিষ্ফল হাহাকার ছাড়া তাহার আর কিছু সম্বল নাই।

লজ্জাশীলার অন্তরের বোবা আকুলতা অবশ্যই এ-কবিতার প্রাণ; কিন্তু কবির অভিনিবেশ নায়িকার, তথা স্তবকগুলির, রূপসজ্জার দিকে। বর্ণনীয়ের এই প্রদীপ্ত অলঙ্করণ, এই পারিপাট্য একান্ত-ভাবে সংস্কৃতকাব্যসুলভ।

রাজরথে যে তরুণ পথিক ঊষালোকদীপ্ত সোনারমুকুট পরিয়া ও কণ্ঠে মুক্তামালা ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে, কনক-মুকুর সম্মুখে নিয়া যে বিচিত্রবসনা তরুণী কেশসংস্কাররত তাহার কবরীবন্ধনের নবীন-কুসুমমাল্য এবং বাসরগৃহের ধূপ-ধূম ও অগুরু-সুরভি যে মাদকতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই পাঠকচিত্তের আকর্ষণ। পঞ্জরস্থ শারিকা, তরুণীর প্রসাধনলীলা প্রভৃতি কালিদাসের কাব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ঊষালোকে, সন্ধ্যায় ও নিশীথে বিচিত্র পরিবেশে একাকিনীর যে তিনখানি চিত্র কবি পাঠককে উপহার দিয়াছেন তাহা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিবার মতো।

"রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি—"

এই চিত্রখানির সহিত মিলন-প্রতীক্ষার চিত্রগুলির যে বৈপরীত্য তাহার প্রতিই কবির লক্ষ্য।

'খেয়া' কাব্যের 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি অনেকটা এই সুরে বাঁধা। পার্থক্য এই, 'শুভক্ষণে'র নায়িকা মিলন-স্বপ্নে ব্যাকুল, 'প্রতীক্ষা'য় আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়াছে; এখানে দেহমন নিঃশেষে হৃদয়স্বামীর 'চরণতলে পড়বে লুটে তবে'—তাহারই প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষার যে বর্ণনা এখানে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে মিথ্যা সম্পদলোভের বঞ্চনার পর ("পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা, কেনা বেচা নানান হাটে হাটে") আজ পরম সম্পদ লাভের আশায় অধীর আগ্রহে সারাদেহ-মন লইয়া যে অপেক্ষমাণা তাহার আকুলতা কবির বর্ণনায় কতদূর ফুটিয়াছে, এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে; কিন্তু তাহার প্রতীক্ষার বর্ণনায় কবি যে হৃদয়ের ইতিহাসকে প্রাধান্য দিবার অপেক্ষা বাসর-শয়নের অপর এক সংস্করণের বর্ণনায় সজ্জা-শিল্পে (decorative art) নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এ বিষয়ে মতভেদের আশঙ্কা কম। কবিতাটির প্রথম স্তবকে বলা হইয়াছে, জীবনের বহু শুভলগ্ন বৃথা গিয়াছে, আজ জীবনের সে-অধ্যায়ের দেনা-পাওনা মিটাইয়া কেবল জীবনের অধিদেবতার অপেক্ষায় রজনীর প্রহর-যাপনের পালা শুরু হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হইয়াছে, প্রেম-পূজার ফুলগুলি তোলা হইয়াছে, গৃহাঙ্গণ চন্দনলিপ্ত করা হইয়াছে। তৃতীয় স্তবকে প্রতীক্ষার রাত্রির প্রথম প্রহরের বর্ণনা এবং অন্ত্য চতুর্থ স্তবকে প্রতীক্ষারতার নিশি-জাগরণের ক্লান্তিকে সফল করিয়া ঈপ্সিতের

আবির্ভাব ও তাঁহার চরণে মিলনার্থিনীর আত্মসমর্পণের কল্পনার ছবি। দ্বিতীয় স্তবকে ভাবের গাঢ়তা অপেক্ষা যুক্তাক্ষর-সন্নিবেশে যে দোলাটি জাগে, প্রথম কয়েক পংক্তিতে সেই দিকেই যেন কবির লক্ষ্য ঃ—

"সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তাহার কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে
অঙ্গন মোর চন্দন সৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে।"

ইহার চরম উদাহরণ হিসাবে 'বীথিকা'র 'উদাসীন' কবিতাটি স্মরণ করিলেই আমাদের যুক্তির যাথার্থ্য স্পষ্ট হইবে,

'তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানিনা কেন যে ছিলে অন্য মনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি' এল ফলগুচ্ছ,—
ভরা অঞ্জলি মোর করি' গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা পানে আঁখি অন্ধ ছিল।' ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ কবিতাটিতেই যুক্তাক্ষরের দোলা নিয়া ছন্দঃ-পরীক্ষা চলিয়াছে; ফলে প্রণয়-আহ্বানে ঔদাসীন্যের বেদনার প্রকাশ গৌণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলির মধ্যে 'জন্মদিনে' গ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতাটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—কবিত্বের দিক হইতে তেমন নয়, যতটা আপন কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ ও গণ-কবির লক্ষণ-নির্দেশের কারণে এবং তথাকথিত গণকাব্যের সমালোচনার দিক হইতে। কবির বক্তব্য এই যে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় কাব্য-সৃষ্টির ভিত্তি। জগতের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যেখানে নাই, সেখানে কল্পনা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ কবির সহায়ক ; কিন্তু কল্পনায় প্রকৃতির রহস্য কিছুটা উদ্‌ঘাটন করা গেলেও 'জীবনে জীবন যোগ করা' ব্যতীত শুধু কল্পনাদ্বারা মানুষের অন্তরের সত্যের উপলব্ধি সম্ভবে না। এই কারণে 'সম্মানের চিরনির্বাসনে' নির্বাসিত কবির কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবন স্থান পায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলিতেছেন,

'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।'

কবির মূল প্রসঙ্গ যদিও ইহা নহে, তথাপি এখানেই এই প্রসঙ্গের শেষ হয় নাই ; 'দুর্গম তুষার গিরি' 'দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা' এবং 'সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর'—ইহাদের সঙ্গলাভের রোম্যান্টিক চিত্র কবি অক্লান্ত ভাবে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন। কবির মূল বক্তব্যের বিস্তারের তুলনায় ইহা অযথা অবান্তর বিস্তার লাভ করিল কি না সে বিষয়ে কবি যেন উদাসীন। কবিতার এইরূপ

সজ্জার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, গৌণ প্রসঙ্গের কেবল সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রলোভনের ফলে অহেতুক বিস্তার সংস্কৃত কাব্যপ্রীতির উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয়তঃ 'দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিস্তব্ধ নীলিমায়' এবং 'দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা'র বর্ণনা এখানে পাওয়া যাইতেছে তাহা 'বসুন্ধরা' কবিতার অনুরূপ চিত্র-কল্পনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আবার এখানে যেমন

'দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্ত্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।·······
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।'

'বসুন্ধরা' কবিতায়ও তেমনি

"·········বসি শুধু গৃহকোণে
লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশ দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে, আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে।"

পুনরুক্তি-প্রবণতা

প্রিয় কোন চিত্রের কল্পনা কবি-চিত্ত একবার আশ্রয় পাইলে ওই 'চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী' কবিকে পুনরুক্তির সমীচীনতা সম্পর্কে বিচারের প্রয়োজন বিস্মৃত করিয়া দেয়। আমাদের মনে হয় কালিদাসের সহিত এখানেও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কল্পিত চিত্র যদি সুন্দর হয় তবে পুনরুল্লেখের ভয়ে কালিদাস-ও লেখনী সংযত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু কালিদাস হইতে উদাহরণাবলির আলোচনার পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা হইতে অনুরূপ উদাহরণের বিচার করিব।

'চিত্রা' কাব্যের 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি 'বিষাদের মহাশান্তি'র আবহাওয়া ঘনাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কবি বলিতেছেন,

"........ গৃহকার্য হল সমাপন,
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।"

এই পর্যন্ত আসিয়া ব্যক্তি-জীবনের ছবিখানিকে কবি চকিতে বৃহৎ বিশ্বের বিপুল আয়তনের ফ্রেমে ধরিয়া তাহাতে নূতন সৌন্দর্যের সঞ্চার করিলেন, যেমন পূর্বে 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় করিয়াছেন। সেখানেও—

'বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে

একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো॥'

'সন্ধ্যা' কবিতায় গ্রাম-বধূর চিত্রখানি কবি-মানসে অপর যে একখানি ছবির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই,—

"………অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম-অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি'
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি'
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো।"

অভিজ্ঞতা-লব্ধ চিত্রখানিকে কবি কল্পনা-লব্ধ এই বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে সৌন্দর্য থাকিলেও অভিনবত্বের সৃষ্টি হয় নাই, কারণ আপনার সৌন্দর্যের জালে আপনি জড়াইয়া কবি 'যেতে নাহি দিব' কবিতাকেই এখানে অনুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ এই চিত্র-কল্পনায়ই কবিতাটির পরিসমাপ্তি যদি-বা ঘটিতে পারিত, কার্যতঃ তাহা হয় নাই। বসুন্ধরার অন্তরের ভাবনা-গুলির মধ্যে কবি প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন,

"ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য-নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধ, শ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে,
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বহুবার আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে[১] এখানে পুনরায় তাহারই অনুবৃত্তি লক্ষিত হইতেছে। অবশ্য একটু পার্থক্য আছে, সন্ধ্যায় আত্মচিন্তামগ্ন মানবের মনে পূর্বস্মৃতি ভিড় করিয়া আসে—ভবিষ্যৎ যেন বিলুপ্ত হইয়া অতীতকে পথ ছাড়িয়া দেয়; কর্মবিরতি অবাধ চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে। সেইরূপ যেন সমগ্র বসুন্ধরা এই মুহূর্তে পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে আত্মবিস্মৃত।

'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটিতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে মধ্যাহ্ন-মূর্তিটি ধরা পড়িয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ একান্ত-বাস্তব বর্ণনায় নদীতটে পল্লীপ্রান্তের যে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ক্রমে কবির ভাবনার মধ্যে হারাইয়া গেল। প্রথমেই—

১। 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি দ্রঃ।

'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন।'

বলিয়া কবিতার আরম্ভে কবি নিমেষেই অলস মধ্যাহ্ন-বেলার কর্ম-বিরতির ছবিখানি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটির প্রথমে কতগুলি খণ্ড দৃশ্যের সমাবেশ ;—

"অর্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি' ফিরে।
চিত্রবর্ণ বিহঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।"

এ পর্যন্ত কতকগুলি খণ্ডদৃশ্য মধ্যাহ্নের সমগ্র চিত্ররচনার উপকরণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলি শুধুই দৃষ্টিগোচর বস্তু। চোখের এই উপভোগের আয়োজনের পরেই নীরস তৃণের গন্ধাভাসে ঘ্রাণগ্রাহ্য জগতের কথা এবং তাহার পরেই বৈরাগী বাতাসের স্পর্শ—

শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।

এবার শ্রুতিপথে পল্লী-মধ্যাহ্নের সুপরিচিত ধ্বনিগ্রাম বাজিতেছে—

"থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিখের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য 'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্তশব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী ॥"

তত্ত্ববিরহিত এই অংশটিতে যে অলস করুণ চিত্রখানি ফুটিয়াছে তাহার সহিত শেষের পংক্তিটিতে প্রকৃতির আপন রঙ্গশালার মধ্যে আসীন মানবসন্তানটির শূন্যমনে উদাসীনতার স্পর্শ লাগিয়াছে। কবি কিন্তু সেখানেই থামিলেন না। প্রকৃতির দিকে চোখ খুলিয়া তাকাইলে, কান পাতিয়া তাহার আপন সঙ্গীত শ্রবণ করিলেই পূর্ব-কথিত বিরহবোধ তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। সেই অতিপ্রিয় অনুভূতিটির পুনরুল্লেখে কবির ক্লান্তি নাই। কবি শেষ করিয়াও শেষ করিতে চান না।

"প্রবাস বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে

পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ ॥”

‘সোনার তরী’র ‘বসুন্ধরা’, ‘সমুদ্রের প্রতি’ প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবটির প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

দিগন্তরেখার প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি মানব সন্তানের চিত্রাঙ্কণদ্বারা তাহার অন্তরের ভাব-বিহ্বলতার মুহূর্তকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস কবির প্রিয় চিত্র-কল্পনার অন্যতম।

“ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ।
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।”

উদ্ধৃত অংশে আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জীবন হইতে বৃহত্তর জীবনের আহ্বানে সাড়া দিবার ব্যাকুলতা একখানি তত্ত্ব-বর্জিত চিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

নিম্নোক্ত কবিতায় বিগত যৌবন-দিনের প্রতি ব্যর্থ করুণ সাভিলাষ দৃষ্টিক্ষেপ ঠিক একই চিত্র-বিন্যাসের মধ্যে প্রকাশমান;—

“যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে;
নবীন পল্লবে বনে বনে

বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।”

বলাকা, ২৫ সংখ্যক কবিতা

এতক্ষণ আমরা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে সার্থক কাব্যসৃষ্টি যদি সম্ভবপর হয় তবে নিজের পুরাতন কবিতার ভাব ও ভাষার অনুকরণে বা পুনরুল্লেখে কবি দ্বিধাগ্রস্ত নন, শুধু সে-অনুকরণ অক্ষমতার নিদর্শন না হইলেই হইল। ‘গীত-বিতান’ খুলিলেই অসতর্ক পাঠকেরও চোখে পড়িবে একই গানের অতি সাধারণ দুই-একটা শব্দের পরিবর্তন করিয়া নূতন সুর বসাইয়া তিনি তাহাকে নবীনত্ব প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। এ রকম উদাহরণ অজস্র। কবিতাকে মাত্র দুই একটি শব্দ সুরের অনুরোধে পরিবর্তন করিয়া গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এরকম উদাহরণও প্রচুর রহিয়াছে।[১]

১। আমরা দিগ্‌দর্শন কল্পে মাত্র একটি করিয়া উদাহরণ উভয় ক্ষেত্র হইতে সংকলন করিয়া এই জাতীয় পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্দেশ করিব।

(ক) গান হইতে গানে পরিবর্তন ঃ—

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধা শ্যামলিম পারে ॥
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা
লজ্জা দিয়ো না তারে ॥

আবার একই গল্প বা নাটক বা কবিতার নাট্যরূপে নবতর প্রকাশ তাঁহার রচনাবলির প্রসার বর্ধিত করিয়াছে। একটি আষাঢ়ে গল্প-তাসের দেশ, শারদোৎসব-ঋণশোধ, প্রজাপতির নির্বন্ধ-চিরকুমার সভা, রাজা ও রাণী-তপতী, প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণ, অচলায়তন-গুরু,

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে
নিভৃত প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে॥

ইহার পাঠান্তর—

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অসীম পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্ত যূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনায় বনে বনে
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে।
দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নতলে
তোমার প্রদীপ জ্বলে—
আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে॥

(খ) বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার সঙ্গীত রূপ :—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপ খানি।

গোড়ায় গলদ-শোধবোধ, বিসর্জন-শ্যামা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। গান, কবিতা ও নাটককে নিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা ও তাহাদিগকে এই প্রকার নব নব রূপদান করিবার প্রয়াসকে আমরা কী ভাবে ব্যাখ্যা করিব ? রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা নাটক ও কাব্যের সীমারেখা নির্ণয় করিতে বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। নাটকের যে নির্দিষ্টরূপ তাহা অপরিবর্তনীয় হইয়া কবির কাছে ধরা দেয় নাই, তাই আঙ্গিক-পরীক্ষার নিমিত্ত ও কাব্যের কবল হইতে নাটকীয় দ্বন্দ্বকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি বারবার নাটককে নিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। রাজা ও রাণী এবং তপতী নাটক সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কৈফিয়ৎ ও দিয়াছেন। তাঁহার নাটকের এলাকায় "লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি"র

দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল লজ্জিত বাসর শয্যাতে
অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥
সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম গীতে॥
নূপুর গুঞ্জরি চল আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুত চঞ্চলা॥

—গীতবিতান (একত্র প্রচারিত সংস্করণ ১৩৫৮)

কারণ দুইটি ;—প্রথমতঃ কবি-চিত্তের সহজ কাব্যময়তা, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব। সংস্কৃতে নাটকও কাব্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃত নাটকের নিরাভরণ রঙ্গমঞ্চ-ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতুর চিত্তে সাড়া তুলিয়াছে। তাঁহার নিজের নাটকেও রঙ্গমঞ্চ সজ্জাবিরল। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে নিজের

(গ) 'তবু' ['মানসী' হইতে]

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি ;
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হ'য়ে আসে দূরস্মৃতি কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যা বেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭

এই কবিতারই সঙ্গীতরূপ (গীতবিতান, একত্র প্রকাশিত সং পৃঃ ৩০০)

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে,
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে ॥
যদি থাকি কাছাকাছি,

মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের নাটকগুলিতে অসজ্জিত রঙ্গমঞ্চ এই মতের জীবন্ত উদাহরণ।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথা ও সুরের মধ্যে সুরেরই যে প্রাধান্য তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। (জীবনস্মৃতি, ১৩৪৪ সং ২১৪ পৃঃ)

কিন্তু এই নীতি ব্যক্তিগত রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া কবি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নতুবা 'উর্বশী' 'ছবি' প্রভৃতি কবিতায় সুর বসানোর অর্থ কী? কথার দৈন্য তো সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার হইবার কথা নয়। বস্তুতঃ এ এক প্রকার কাব্য-বিলাসই বটে।

বলা বাহুল্য, কবির কল্পনার দৈন্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমন কথাও বলা চলে যে ইহা স্রষ্টার আপন সৃষ্টি লইয়া এক প্রকার খেলা। কবি-মানসের এক প্রকার বিলাস এবং তাহারই সঙ্গে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ইহার মধ্যে প্রকাশমান। কালিদাসের কাব্যে ঠিক এই জাতীয় বিলাস বিদ্যমান। একই শ্লোক নিয়া—কখনও তাহার সাধারণ কিছু সংস্কার করিয়া, কখনও মোটেই

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি কি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে—
তবু মনে রেখো
যদি পড়িয়া মনে
ছলো ছলো জল নাহি দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো॥

না করিয়া—পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইবার বিচিত্র সাধ কালিদাসেরও ছিল। কালিদাস ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের সমপথচারী এ বিষয়ে আর কোন কবি নাই। মেঘদূতের অলকাপুরীর ও কুমার-সম্ভবের ওষধি-প্রস্থের বর্ণনা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে বিবাহ-বর্ণনা ও নারীগণের বরবধূ-দর্শন, যুদ্ধ-বর্ণনা ইত্যাদিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। কোন ক্ষুদ্র-শক্তি কবির পক্ষে এতখানি আত্মপ্রত্যয় যে সম্ভবপর ছিল না একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এইবার আমরা চিত্র-কল্পনায় কবির উক্ত বৈশিষ্ট্য কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিতেছি।

(ক) সুন্দর যদি হয় তবে একই চিত্রের পুনঃ পুনঃ প্রকাশে কবির ক্লান্তি নাই। পুষ্পাভরণা উমা যখন শিবকে গিয়া প্রণাম করিলেন তখন তাহার কেশকলাপের মধ্যগত কর্ণিকার কুসুম ও কর্ণভূষণ-পল্লব স্খলিত হইয়া পড়িল ;—

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি
বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুত-পল্লবেন
মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়॥, —কুমার ৩।৬২

আবার ঋষিগণ ও অরুন্ধতীকে তিনি যখন প্রণাম করিতেছেন তখন তাঁহার সুবর্ণময় কর্ণভূষণ স্খলিত হইয়া পড়িল,—

তাং প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদাবতংসকাম্।
অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানামরুন্ধতী॥ ৬।৯১

(খ) কল্পিত-অলঙ্কারবিন্যাসের চমৎকৃতি কবির অতিপ্রিয়, পার্বতী ও ইন্দুমতী উভয়ের বিবাহ-কালেই যজ্ঞধূম তাঁহাদের 'মুহূর্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে' —কুমার ৭।৮১, রঘু ৭।১৭

শিব-শিবানীর জল ক্রীড়া বর্ণনায়

হেম-তামরস-তাড়িতপ্রিয়া
তৎকরাম্বু-বিনিমীলিতেক্ষণা।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা
মীনপংক্তি-পুনরুক্তমেখলা॥ —কুমার ৮।২৬

[শঙ্কর যখন উমাকে স্বর্ণপদ্ম দ্বারা ও জলের অঞ্জলি দ্বারা তাড়না করিতেন তখন দেবী ঝাঁপাইয়া মন্দাকিনীতে পড়িতেন ও ত্রস্ত মীনপংক্তি তাঁহাকে যেন আর একখানি রশনা পরাইয়া দিত।]

আবার সীতার বাতায়ন-লম্বিত হাতে মেঘ বিদ্যুদ্বলয় পরাইতেছে,—

করেণ বাতায়ন-লম্বিতেন
স্পৃষ্টস্ত্বয়া চণ্ডি কুতূহলিন্যা।
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়-
মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্‌বলয়ো ঘনস্তে॥ —রঘু ১৩।২১

রসাতল হইতে উদ্ধৃত ধরিত্রীর বিবাহোচিত অবগুণ্ঠন সমুদ্রের বারিরাশি,—

রসাতলাদাদিভবেন পুংসা
ভুবঃ প্রযুক্তোদ্‌বহনক্রিয়ায়াঃ।
অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধং
মুহূর্তবক্ত্রাভরণং বভূব॥ —রঘু ১৩।৮

সমুদ্র-ফেনরাজি বিরাট্‌কায় জলজন্তুগণের কর্ণবিলম্বিত চামর,—

মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভি-
র্ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।

কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং
ব্রজন্তি কর্ণ-ক্ষণচামরত্বম্॥ —রঘু ১৩।১১

(গ) মণিজ্যোতিতে নাভিরন্ধ্র অঙ্গুলিরন্ধ্রাদি পূর্ণ হইবার বর্ণনা সৌন্দর্য-বর্ণনার অঙ্গ,—

তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং
ররাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য
তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চিঃ॥ —কুমার ১।৩৮

[নীবীবন্ধ অতিক্রম করিয়া তাহার গভীর নাভিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম রোমাবলী মেখলার মধ্যমণি নীলকান্তের দীপ্তির ন্যায় শোভা পাইত।]

অন্যত্র—

"জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ
হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ॥ —কুমার ৭।৬০

[অন্য এক রমণী বাতায়ন পথে চাহিতে চাহিতে দ্রুতবেগে চলিতে গেলে কটিগ্রন্থি শিথিল হইলেও পুনরায় বন্ধনের অবকাশ পাইলেন না। কটিবসন হস্তদ্বারা সংযমিত করিবার সময়ে করাভরণের দীপ্তি তাঁহার নাভিগহ্বর পূর্ণ করিল।]

ইন্দুমতী স্বয়ংবরের বর্ণনায়—

কশ্চিদ্ যথাভাগমবস্থিতেঽপি
স্বসন্নিবেশাদ্ ব্যতিলঙ্ঘিনীব।
বজ্রাংশু-গর্ভাঙ্গুলিরন্ধ্রমেকং
ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে॥ —রঘু ৬।১৯

[কোন রাজা যথাস্থানে আরোপিত থাকিলেও যেন কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া স্বহস্তে রত্নময় কিরীট সুসন্নদ্ধ করিতে গেলে কিরীট-খচিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের প্রভায় তাঁহার অঙ্গুলীর রন্ধ্রসমূহ পরিপূর্ণ হইল।]

এতক্ষণ আমরা চিত্র-কল্পনার পুনরুল্লেখগত বিলাসের কথা বলিলাম। কিন্তু পূর্বে ঋতু-সংহারের গ্রীষ্ম ও বর্ষার বর্ণনায় কবি যে চিত্র-বিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি (ময়ূরপুচ্ছের মধ্যে সর্পের ও সর্পের ফণার নিম্নে ভেকের আশ্রয় গ্রহণ, বর্ষার বঙ্কিম স্রোতোধারাকে সর্প মনে করিয়া ভেকের ত্রস্তভাবে অবস্থান প্রভৃতি) তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(ঘ) ভাব-বিলাস: প্রেম ও মৃত্যু

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যেই প্রেম একটি বিপুল শক্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেঘদূতে ইহাই প্রধান উপজীব্য, রঘুবংশে-ও ইহার প্রেরণা প্রবল। নাটক-গুলিতে ইহারই প্রধান প্রতিষ্ঠা। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, এই প্রেম প্রধানতঃ দেহকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু ভোগের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শকুন্তলায় ও কুমারসম্ভবে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুন্দর হইয়া উটিয়াছে। নাটক ও প্রাচীন কাব্য বস্তুতন্ত্রী (objective) বলিয়া সেখানে কবির ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির সুর বাজে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রধানতঃ অহংমুখী হইলেও তাহাতে প্রেমের সাধারণ ছবির যেমন প্রকাশ আছে তাহার তুলনায় ব্যক্তিচিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস ও গভীর অনুভূতি লইয়া ব্যক্তিজীবনের প্রেম অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক রচনায়ই স্পন্দমান। 'শেষের কবিতা'য় দুজন মানুষের স্থান আছে

বলিয়া ডনের কাব্যের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজের কাব্যে এই স্থান খুব প্রশস্ত নয়। অবশ্য প্রেমের গান যে তাঁহার অনেক আছে এ কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি।

প্রেম-বৈচিত্র্যের বিবর্তন—কালিদাস-ভবভূতি-বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ-রবীন্দ্রনাথ

প্রেমের চিত্রের অঙ্কনে সংস্কৃত কাব্যে দেহের যে প্রাধান্য ভবভূতির কাব্য তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সূচনা করিয়াছে। অনুভূতি সেখানে দেহসর্বস্বতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হইতেছে। পরবর্তী কালে বাংলায় বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমবৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলন কল্পনায় প্রেমের দেহাতীত ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে এই দেহাতিগ প্রেমবৈচিত্র্যলীলার, এই মিলনের মধ্যেও বিরহের কল্পনার মুগ্ধ প্রশস্তি রহিয়াছে। বৈষ্ণব কাব্যের এই ভাবটি কালিদাস হইতে বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয়া বিবর্তন লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ে একটি শ্লোকে দেখিতেছি, রাজা বলিতেছেন,—

রতিখেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্।
সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্॥

[যে তুমি শয্যায় রতিশ্রমসুপ্ত আমাকে প্রবাসগত বলিয়া মনে কর সেই তুমি আমার এই এমন চিরবিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিলে ?]

ঋতু-সংহারের বসন্ত-বর্ণনের ৮ম শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ এই :—

"সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্যঃ ॥"

[এই বসন্তকালে আপন বল্লভ নিকটে থাকা সত্ত্বেও, "কামিনীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিয়াছে ;"] ইহাই "কোড়ে করিয়া কত দূরে হেন মানয়ে।"

ইহার পাশেই গোবিন্দদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥
এ সখি, আরতি কহনে ন যাই।
হেম আঁচরে রহু ভরমিত যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞি ॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
বিরহ-বেদনে রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

কালিদাসের শ্লোকদ্বয়ে এই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা এই—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি
প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ
প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ —শৃঙ্গারভেদঃ, ১৩৪

[দয়িত সন্নিধানে অবস্থান করিলেও অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ বিরহবোধের কল্পনায় যে কাতরতা তাহাকে প্রেম-বৈচিত্র্য বলা হয়।]

রূপ গোস্বামীর সংজ্ঞা আর কালিদাসের

'সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্যঃ'

একই কথা।

ভবভূতির মধ্যে প্রেমে মিলন-বিরহ বোধ যখন ভাবাবেশে এক বোধ হইতেছে তখনকার বর্ণনা,

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

—উত্তররামচরিত ১ম অঙ্ক ৩৫

[বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না এ সুখ না দুঃখ, আমি প্রমোদগ্রস্ত না নিদ্রিত, আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে না মদ্যপানজনিত মত্ততা আবির্ভূত হইতেছে। যখনই তোমার গাত্রস্পর্শ হইতেছে তখনই বিহ্বলতা উৎপাদন করিয়া কি অদ্ভুত বিকার আমার চৈতন্য কখনো বিলুপ্ত কখনো প্রবুদ্ধ করিতেছে।][1]

১। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভবভূতিতে দেহস্পর্শ

ভবভূতির "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োঃ" শ্লোকটির ভাব ইন্দ্রিয়বিকারকে পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই ভাব এবং বৈষ্ণব কবিতার প্রেমবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে ভাষা পাইয়াছে,—

'সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে।'

'মহুয়া'র 'দীনা' কবিতায়ও এই ভাবটি আছে,—

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।"

হইতে এই বিহ্বলতা নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। শুধু উত্তরচরিতে নয়, মহাবীরচরিতেও—

"বৈদেহীপরিরম্ভ এষ চ মুহুশ্চৈতন্যমামীলয়-
ন্নানন্দী হরিচন্দনেন্দুশিশিরস্নিগ্ধো রুণদ্ধ্যন্ততঃ" ॥

[বৈদেহীর এই আনন্দময় হরিচন্দন-চন্দ্র-শীতল আলিঙ্গন মুহুর্মুহুঃ আমার চৈতন্যের বিকাশ ও বিলোপ সাধন করিতেছে।]

কিন্তু গাঢ় ভাবাবেগের এই প্রকাশ সত্ত্বে-ও কালিদাসের কাব্য হইতে উদাহৃত শ্লোকে যেরূপ দেহস্পর্শ হইতে ইন্দ্রিয়বৈকল্যের কথা রহিয়াছে তাহার ঊর্ধ্বে কোন সূক্ষ্ম ভাবলোকে ভবভূতিও বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভবভূতির অনুভূতি-ও স্পর্শজ ; ইন্দ্রিয়ভোগের রাজ্যের ঊর্ধ্বে তাহার বিস্তার নয়।

'লিপিকা'র 'মেঘদূতে'ও এই সুর বাজিতেছে,—

"তার পাশে আছি, তবু নির্বাসন"। ইত্যাদি।

অবশ্য কালিদাস হইতে বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব কবিতা হইতে রবীন্দ্রনাথে একই ভাবের যথাযথ অনুসরণ হয় নাই ; ক্রমশঃ রহস্যময় মানস-সাযুজ্যবোধের মধ্যে দেহ-চেতনা হারাইয়া গিয়াছে। মিলনোৎসুক চিত্তের ঐকান্তিকতা, অপরিমেয় অভিলাষ, সর্বগ্রাহী ভাবাবেগ বৈষ্ণব কবিতায় প্রকাশমান ; অপর পক্ষে মনোলোকের কল্পনা ও অনুভূতির যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য নিরন্তর প্রিয়জনকে নূতন করিয়া তুলিতেছে, যাহার বলে চিরপুরাতন জীবনসঙ্গী 'পড়া পুথিসম' শেষ হইয়া যাইতেছে না, তাহাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই 'পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে' বিরহবোধের অভিনব চেতনার মূলে কাজ করিতেছে।

দেহ-স্পর্শ হইতে সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণের উদয় কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশমান,—

রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ
স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন
সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ —কুমার ৭।৭৭

আসীদ্বরঃ কণ্টকিত-প্রকোষ্ঠঃ
স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী।
তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণমাত্রবৃত্তিঃ
সমং বিভক্তেব মনোভবেন ॥ —রঘু ৭।২২

"He is not gross nor sensual, b t it is not correct to say that his ideas and objects are spiritually rarified ; on the contrary, the touch of sensuousness is too warmly conspicuous to be ignored."
Hist. of Sans. Lit.—De and Dasgupta. P. 297.

উভয় শ্লোকেই পাণি-স্পর্শে ইন্দ্রিয়বৈকল্যসূচক স্বেদ ও রোমাঞ্চের প্রকাশ এবং আত্মবশে না থাকিবার কথা রহিয়াছে।

মৃত্যু—ভাব-বিলাস

মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রাণি-সুলভ ভীতির প্রকাশ বিরল। 'সিন্ধুদোল' ও 'দেবতার গ্রাস' কবিতায়-ও যথাক্রমে 'প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়' ও মহৎ আত্মত্যাগের ভাব বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

মৃত্যু সম্পর্কে কবির মহৎ বিস্ময়ও নাই। মৃত্যুর স্বরূপ কবির সুপরিজ্ঞাত। কবির কল্পনায় সে অনভিপ্রেত ভীষণ আগন্তুক নয়। সে দয়িত, সে 'শ্যাম সমান,' জীবন-বধূ স্বেচ্ছায় তাহার অনুগত হইবে; মিলনার্থ কবিচিত্তের নিকট সে বিবাহার্থী 'বিলোচন'। মৃত্যু জীবনের পক্ষে অভিশাপ নয়, সে 'এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'। মৃত্যুর রাজ্যের সহিত জীবন-লোকের নিকট সম্পর্ক ; মৃত্যু শুধু—

"তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।"

'ডাকঘর' নাটকে মৃত্যুর আবির্ভাব রহস্যময় বটে কিন্তু ঠাকুরদার নিকট তাহার স্বরূপ অবিদিত নয়। জীবন ও মরণের পরম বিধাতা মানুষকে 'ডান হাত হতে বাম হাতে' এবং 'বাম হাত হতে ডানে' নিয়া নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন।

মৃত্যুকে লইয়া ইহা বিচিত্র ভাববিলাস। ইহার কাব্যত্ব অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে মৃত্যুর নিশ্চিত আবির্ভাবের মধ্যে যে অতলস্পর্শ রহস্য, মানবচিত্তে তাহার সম্পর্কে

যে অসীম কৌতূহল ও প্রচণ্ড ভীতি স্বাভাবিক এখানে তাহা নাই। প্রিয়জনের মৃত্যুর ফলে মানুষের বিদীর্ণ হৃৎ-পঞ্জর হইতে যে সান্ত্বনা-হীন হাহাকার উদ্গত হয় তাহার প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে বিরল।

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
যে-সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।
—শেষ প্রতিষ্ঠা, পলাতকা।

এই দৃষ্টিতে রস অপেক্ষা তত্ত্ববোধ অধিকতর প্রকট।

'স্মরণ' নামক যে ক্ষুদ্র কাব্যখানি লোকান্তরিতা কবি-পত্নীর উদ্দেশ্যে ব্যক্তি-জীবনের শোককে উপজীব্য করিয়া রচিত সেখানেও কবি মোটেই দুর্বহ উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়েন নাই। শোকও এখানে কাব্যোপযোগী এক রম্য অনুভূতি হইয়া উঠিয়াছে; ইহাতে সংস্কৃত কাব্যের পূর্বকথিত প্রকৃতির পরিচয় মেলে।

অবশ্য দর্শন শাস্ত্রের আকর ভারতবর্ষে মৃত্যু রহস্যময় নয়; মানুষের পক্ষে দেহান্তর প্রাপ্তি পরিধেয়ান্তর গ্রহণেরই মতো। কিন্তু দার্শনিক চেতনা অপেক্ষা মর্ত্যমানবসুলভ যে দুর্বলতা কাব্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বৃত্তি কালিদাসের কাব্য হইতেই তাহার উদাহরণ সংকলিত হইতে পারে। ইন্দুমতীর শোকে বিহ্বল অজকে বশিষ্ঠ-শিষ্য গুরুর উপদেশে আসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন।

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।

ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্
যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ ॥ —রঘু ৮।৮৭

মৃত্যুর **সম্বন্ধে** এই ধারণায় বশিশ্রেষ্ঠ **বশিষ্ঠের** চরিত্রের উপযুক্ত মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল তিনি ভোগী, তিনি পার্থিব, তিনি প্রেমিক; মুখে বশিষ্ঠের কথা স্বীকার করিয়া নিলেও সে উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে স্থান না পাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমেই ফিরিয়া গেল।

"তদলব্ধ-পদং হৃদি শোকঘনে
প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ ॥" ঐ ৮।৯১

ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজ আট বৎসর কী ভাবে কাটাইলেন?

তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ
প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং
লাভং প্রিয়ামনুগমনে ত্বরয়া স মেনে ॥ —ঐ ৮।৯৩

[বটবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন প্রাসাদগাত্র বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, শোকশল্য তেমনি তাঁহার. হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। বৈদ্যগণের অসাধ্য প্রাণান্তকর সেই শোকশেলকে তিনি শীঘ্র প্রিয়ামিলনের সহায় জানিয়া পরমলাভ বলিয়া মনে করিলেন।]

তাহার পর

"রোগাপসৃষ্টিতনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ
প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব ॥" —ঐ ৮।৯৪

[ধারণের অযোগ্য রোগজর্জর দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজা প্রায়োপবেশনের অভিপ্রায় করিলেন।]

এ শোক প্রৌঢ় জীবনের। ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ যেন ইহাতে লাগিয়াছে।

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ ॥
গতমাভরণ-প্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ —ঐ ৮।৬৬

এবং

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্যগণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈ-
র্মমসর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ —ঐ ৮।৬৯

বাস্তবানুগ দৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই যে শোকোচ্ছ্বাস তাহার পরেই পরলোকে প্রিয়ামিলনের আশায় গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে প্রায়োপবেশনযোগে অজের তনুত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেই দেখি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী হইয়াছেন যে প্রিয়তমা তাঁহার সহিত নন্দন কাননের মধ্যগত বহু বিলাসগৃহে রাজা পুনরায় বিহারে রত হইলেন।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে দেহত্যাগের পর স্বর্গ-লাভই কাম্য বলিয়া সংকল্পিত হইয়াছে। এই স্বর্গ ভোগৈকরস সুখস্বর্গ। আজিকার দৃষ্টিতে ইহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হউক আর না-ই হউক, স্মৃতিশাসিত কালিদাসের যুগে পরলোক-বিশ্বাসী শ্রোতৃমণ্ডলীকে এই কল্পনা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ করে নাই। কিন্তু সে যাহাই হউক, মৃত্যু যে এখানে রহস্যময় বলিয়া কল্পিত হয় নাই এবং স্বর্গে উক্ত বিহারের উল্লেখে পূর্বকথিত "রসপূর্ণ বিদগ্ধতা"র প্রকাশ যে রহিয়াছে এবং

সর্বোপরি, মৃত্যুর দুঃসহ অভিঘাতকে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও সুসহ করিয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দুমতীর মৃত্যুর মধ্যে যে স্বাভাবিক কাব্যোচিত পরিবেশ—পারিজাতের স্পর্শে সুন্দরীর অচিন্তনীয়রূপে তনুত্যাগ ও সদ্যোমৃতার সৌন্দর্য—ইহার মধ্যে কবি কাব্যের উপাদান খুঁজিয়াছেন। এই সৌন্দর্য যখন তিনি বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন অজবিলাপের সেই প্রথম দিকের শ্লোক-রাজিতে শোক অপেক্ষা যেন কবির সৌন্দর্যবর্ণননৈপুণ্য অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কামপ্রিয়ার বিলাপে যে দেহমুখ্যতার প্রকাশ অযোধ্যাধিপতির বিলাপে তাহা মোটেই প্রবল হইয়া ওঠে নাই।

সাংকেতিকতা—কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কালিদাসের কাব্যের সাংকেতিকতা কত দূরবিসর্পী এবং রবীন্দ্রচিত্ত কালিদাসের কাব্য হইতে রূপকার্থ ও সাংকেতিকতা সন্ধান করিবার ব্যাপারে কত তৎপর তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। এইবার কালিদাসের কাব্যের চিত্র ও ভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সাংকেতিকতার পথে কেমন করিয়া চিত্র ও ভাবের প্রসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে আলোচনা করিব।

মৃত্যুর আবির্ভাব ও কুমারসম্ভবের চিত্র-কল্পনা

কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বহু কবিতায়। 'উৎসর্গে'র 'নববেশ' ও 'মরণমিলন' কবিতায় মৃত্যু মহেশ্বরের বেশে আসিয়াছে। সে রুদ্র, কিন্তু সে প্রেমিক। জীবনবধূ সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাকে বরণ করিবার জন্য।

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন তাপস মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার আনিয়াছ সাথে করিয়া,
তাপস মূরতি ধরিয়া॥
নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত এসো মোর ভাঙা আলয়ে,
ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি, সব ধন মোর না লয়ে।
এসো এসো ভাঙা আলয়ে॥

—নববেশ

'উৎসর্গ' গ্রন্থের 'মরণমিলন' কবিতায় কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে মহেশ্বরের বিবাহ যাত্রার বর্ণনা দুইটি দীর্ঘ স্তবকে "যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন" হইতে জীবনবধূর উদ্দেশে মৃত্যুর বরযাত্রার প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

ঋতু-বর্ণনা ও কুমারসম্ভব

রবীন্দ্রকাব্যে ঋতুবর্ণনায় বৈশাখ রুদ্রতপস্বী—ধরণী তপস্বিনী, কোথাও এই তপঃক্লশতনু বৈশাখের তপস্যা সৌন্দর্য ও মাধুর্য লাভের জন্য, কোথাও নববর্ষার বর্ষণ-প্রসঙ্গ আসন্ন করিবার জন্য। কখনও দেখি রুদ্ররূপী গ্রীষ্ম মধ্য-দিনে 'প্রান্তর-প্রান্তের কোণে' আসীন, দেবাদিদেবের সাধনা যেমন "সুকোমল দুর্বল সুন্দর বাহুর করুণ আকর্ষণে" (উৎসর্গের ২৬ নং কবিতা) ধরা দিবার জন্য তেমনি 'মধুরের-স্বপ্নাবেশে-ধ্যানমগন-আঁখি।'

অন্যত্র আবার এই ছবিরই অনুসরণ চলিয়াছে—

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে।
তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥

গানের শেষভাগে কুমারসম্ভবের রুদ্রের তপস্যার কল্যাণ-সুন্দর যে অবসান রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার সহিত সুসঙ্গত মোহন আশ্বাস আছে ঃ—

দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়া রবে
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে।'

কুমারসম্ভবের পূর্ণ চিত্রখানির অবলম্বনে প্রকৃতির রূপ বর্ণিত হইয়াছে নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে,—

তপস্বিনী হে ধরণী, ওই-যে তাপের বেলা আসে—
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে ॥
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃশীলা,
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্নি নিশ্বাসে।
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহুগীতে
এক হয়ে মিশে থাক মৌন মন্ত্র ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে ॥

কুমারসম্ভবের মহাদেবের মানবীয়তা রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি এবং প্রসঙ্গতঃ 'তপোভঙ্গ' কবিতা হইতে উদ্ধৃতি সহকারে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'তপোভঙ্গ' কবিতার—

"হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব"

ইত্যাদি পংক্তির ভাবই বর্ষার আবির্ভাবের নিমিত্ত রুদ্ররূপ বৈশাখের অপেক্ষার কল্পনায় নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয়ে অনুসৃত হইয়াছে।

"পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পূরব কূলে বকুল-বীথি মাঝে,
লুটায়ে পড়া অমল-নীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি!
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।"

—নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

এ বর্ণনা 'তপোভঙ্গ' কবিতার তথা কুমারসম্ভবের স্মারক। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে কবি কালবৈশাখীর বর্ণনা করিতেছেন—

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি' উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে;
মুহূর্তে অম্বর-বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হ'য়ে যায় ঔদাসীন্য-কঠোর বন্ধন॥

এই বর্ণনায় 'পুষ্করবীজমালা'-স্পৃষ্ট ও 'কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য' 'ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্যমুখ' রুদ্রের তৃতীয়নয়নবহ্নির আকস্মিক বিকাশ ও মদন, তথা বসন্তশ্রীর বিনাশ এবং রতির বিলাপ প্রতি পংক্তিতে পাঠকের মনে পড়ে।

'তপোভঙ্গ' কবিতার

"……শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃ সূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।"

এই বর্ণনার অনুসরণই নিম্নলিখিত গানটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাটি বসন্ত-প্রশস্তি।

"সন্ন্যাসী যে জাগিল, ঐ জাগিল ঐ, জাগিল,
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশান-চিতাভস্মরাশি—ভাসিল কোথা, ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো,
চূর্ণ হয়ে রং জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তা'রে,
হৃদয়ে তা'র লাগিল,
আয়রে তোরা, আয়রে তোরা আয়রে,
রঙের ধারা ঐ যে ব'হে যায় রে॥"

শুধু গ্রীষ্ম নয়, শীত ঋতু ও রুদ্র সন্ন্যাসীরূপে কল্পিত হইয়াছে। রুদ্রের সমস্ত কঠোরতা ধরণী সহ্য করিয়াছে তাহাকে প্রসন্ন করিতে; এইবার সে বরবেশে আবির্ভূত হইয়া ধরণীর সাধনা সার্থক করুক।

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।
... ...
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি প্রলয়-বেদনা নিল বুক পাতি
রুদ্র, এবার বরবেশে তারে করগো ধন্য—হও প্রসন্ন ॥

নিচের গানটিতে এই চিত্রেরই প্রকাশ,--

মোরা ভাঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন
... ...
পলাশরেণুর রঙ মাখিয়ে নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে
তোমার পুরানো আচ্ছাদন ॥

'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'য় কালের অধীশ্বর নটরাজের কল্পনায় পৌরাণিক শিব ও কুমারসম্ভবের শিবের যৌথ প্রভাব রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত কোন কোন কবিতায় কুমারসম্ভবের কাহিনী, চিত্র ও ভাব কেবল প্রসাধনকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে কখনও প্রভাব এত সূক্ষ্ম, এত দুর্লক্ষ্য যে সমালোচকগণের মধ্যে সর্বত্র ঐকমত্য না হইবার সম্ভাবনা আছে। 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' কবিতায় প্রথম শব্দটি 'ঈশান' এবং ঈশানোদ্ভব 'পুঞ্জমেঘ' অন্ধবেগে সৃষ্টিকে লোপ করিতে আসিয়াছে। তাহার পরে কবিতার শেষে দেখি সৃষ্টি-ধ্বংসের মধ্যেই কবি কবিতার শেষ করেন নাই, 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে' নবজীবন ও নবীন সৌন্দর্যের চিত্র প্রকৃতির রুদ্রলীলার স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, নবজীবনের সূচনাকে কবি বলিতেছেন 'সদ্যোজাত মহাবীর', বলিতেছেন 'কুমার' ['হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান।'] মহাবীর দেবসেনাপতি

কুমার কার্তিকেয়ের ধনুর্বাণধারণেব বৈশিষ্ট্য-ও এ ছবিখানিতে আছে। তৃতীয়তঃ, আমরা জানি মহাকাব্যের লক্ষণাবলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে 'আশীর্নমস্ক্রিয়াদি' জ্ঞাপনের যে বিধি ছিল তাহাতে অনেক সময়ে কৌশলে উল্লেখদ্বারা উক্ত নমস্ক্রিয়াবস্তু-নির্দেশাদি সাধিত হইত। এই কবিতাটিতেও 'ঈশান' শব্দটি প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া উক্ত দিক্-কোণের অতিরিক্ত 'রুদ্র' অর্থের সংকেত বহন করিবে এইরূপ কোন অভিপ্রায় কবিচিত্তে ছিল বলিয়া মনে হয়।

'কথা' কাব্যের 'অভিসার' কবিতাটিতে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের বর্ণনায় কবি যখন লিখিতেছেন 'শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি' তখন উপমাটিদ্বারা কুমারসম্ভবের সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখরের চিত্রখানিই যেন উপস্থাপিত হইয়াছে।

'মহুয়া' কাব্যের 'শুভযোগ' কবিতাটি ভাব-সামঞ্জস্যের কারণে কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকটির স্মারক।

কালিদাসের শ্লোকটি এই—

তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা
সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে।
চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে
মধৌ পরভৃতোন্মুখী॥

["বসন্তকালে সহকারলতা যেমন যাহা কিছু বলার, ঋতুরাজকে জানাইবার সমস্তই কোকিলার কুহু-ধ্বনিচ্ছলে জানাইয়া নিজে উৎফুল্ল-হৃদয়ে বিরাজ করে উমাও তদ্রূপ, সখীমুখে মহাদেবকে সংবাদ পাঠাইয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া, মহাদেব-বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্পা হইয়া রহিলেন।]

'শুভযোগ' কবিতায়ও হৃদয়ের প্রেম-বার্তা মুখে প্রকাশ করা হয় নাই, বসন্তের দূত শিমূল-পলাশের উপর অন্তরের রহস্য নিবেদন করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

'যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে,—
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি,
শিমূল পাগল হয়ে মাতে—
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা,
উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে॥"

একই প্রকারের সূক্ষ্ম সাংকেতিকতা উভয় কবিতার প্রাণ।

অসমাপ্ত-প্রসাধনা সুন্দরীদের বর্ণনা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অসমাপ্ত-প্রসাধনা সুন্দরীদের বর্ণনা একটি গতানুগতিক অধ্যায় রচনা করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য হইতে এই ধারার আরম্ভ এবং ভারতচন্দ্রে এই ধারার শেষ। বরবধূর রূপ-দর্শনে ত্বরান্বিত সুন্দরীগণ নিজেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে যে রূপের ডালি বহিয়া আনিয়া পাঠকসমীপে ধরা দিয়াছেন তাহাতে একাধিক প্রকারে মাধুর্যসৃষ্টি হইয়াছে। কবিরা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের রূপ ও রুচির বিকার বর্ণনা করিয়া এক জাতীয় আনন্দলাভ

করিয়াছেন ও তাহার সহিত নারীগণের পতিনিন্দা প্রসঙ্গ জুড়িয়া দিয়া পাঠককে এক প্রকার রঙ্গ রসিকতার আসরে টানিতে চাহিয়াছেন আজিকার যুগের পাঠকের মার্জিত রুচি যাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সহজেই অস্বীকার করে।

সংস্কৃত কাব্যে এই ধরণের বর্ণনা সম্ভবতঃ প্রথম পাওয়া যায় অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'। কিন্তু অশ্বঘোষে আমাদের প্রয়োজন নাই, কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই ব্যাপারের সংযোগ নির্ণয়ই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। অশ্বঘোষের পরে কালিদাসে এই প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। সংস্কৃত কাব্যের এই বর্ণনার উত্তরাধিকারী প্রথমে হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। পদাবলী সাহিত্যে ইহার যেটুকু পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা এই যে রাধার ও গোপীদের অভিসার বর্ণনায় অসমাপ্ত প্রসাধন ও অস্থানোচিত প্রসাধনের সৌন্দর্য উভয়েই সেখানে কাব্যের উপজীব্য হইয়াছে এবং বরবধূর রূপ দর্শনের প্রসঙ্গ সেখানে নাই।

অসমাপ্ত প্রসাধনের সৌন্দর্য-বর্ণনার উদাহরণ গোবিন্দ দাসের 'শরদচন্দ, পবন মন্দ' ইত্যাদি পদটিতে মিলিবে। বংশীরবে আকুল গোপীগণ যখন সংকেতস্থলে ছুটিয়া যাইতেছে তখন তাহাদের বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন,—

"বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ,
এক নয়নে কাজর-রেহ,—
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু,
একু কুণ্ডল ডোলনি॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ,
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ,

খসত বসন রসন চোলি,
গলিত বেণী-লোলনি।
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দ দাস গাওনি ॥"

নিম্নের পদটিতে দয়িত-মিলনার্থিনীর অস্থানোচিত বেশবিন্যাসাদির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার নাম 'বিভ্রম'।

"রাই সাজে, বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল।
কি করিতে কি না করে, সব হৈল ভুল ॥
মুকুরে আঁচড়ি রাই বান্ধে কেশভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥
করেতে নূপুর পরে, জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে, কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে, নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥
বংশীবদনে কহে—যাও বলি হারি।
শ্যাম অনুরাগের বালাই লইয়া মরি ॥"

রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার "চিরায়মানা" কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলী হইতে উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে যে কৃত্রিমতা ও বাস্তববিরোধিতা বর্তমান তাহার লেশমাত্র স্পর্শ নাই। সৌন্দর্যের অপূর্ণ প্রকাশ, অনায়াস-প্রকাশে যে একটি স্বাভাবিক মাধুর্য আছে তাহা তাঁহার

কবিচিত্তে সাড়া তুলিয়াছিল এবং আলোচ্য কবিতাটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই অসমাপ্ত-প্রসাধনা সুন্দরীগণের বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত উক্ত যাবতীয় কবিদের সহিত পরিচিত হইলেও বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যকে স্মরণ করিয়াই আলোচ্য কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। কবিতা-পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যে-সুন্দরীকে দিনশেষে মেঘ-ঢাকা আকাশের নিচে সহজবেশে দ্রুত পদে চলিয়া আসিতে কবি আহ্বান করিয়াছেন তিনি "বিংশ-শতকিয়া" নন। পত্রলেখা তাঁহার অঙ্গভূষণ, তাঁহার অলক্তক-রঞ্জিত চরণে নূপুর, গলায় তাঁহার মৌক্তিক মাল্য, চোখের কোণে কজ্জল-রাগ না থাকিলে প্রসাধন তাঁহার পূর্ণতা লাভ করে না। ইনি কালিদাসের কাব্যেরই নায়িকা। ক্ষণিকা-কল্পনার যুগে রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাসের কাব্যের আবহাওয়ায় সঞ্চরণ করিয়াছেন এই কবিতাটি-ও তাহার সাক্ষী। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর যুক্তি আছে। কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে (অবশ্য আমরা পূর্বেই অন্যত্র বলিয়াছি যে রঘুবংশে-ও কুমারসম্ভব কাব্যের বক্ষ্যমাণ শ্লোকগুলি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে) বরবধূ-দর্শনার্থিনী অসমাপ্ত-প্রসাধনাদের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত এই কবিতাটির নানাবিধ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ কালিদাসের কাব্যে পাঁচটি শ্লোকে এই বর্ণনা সাধিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের স্তবক-সংখ্যাও পাঁচ। কালিদাসের উক্ত পাঁচটি শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি পাশাপাশি রাখিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইতে পারে।

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা
কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ
করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ॥—কুমার ৭।৫৭

[যে স্থান হইতে শিবকে ভালো দেখা যাইবে এমন জায়গায় দ্রুত যাইতে গিয়া কোন সুন্দরীর কবরীবন্ধন-মাল্য স্খলিত হওয়ায় স্রস্ত কেশপাশ পুনরায় বন্ধনের কথা বিস্মৃত হইয়াই তিনি চলিলেন।]

প্রসাধিকা-লম্বিতমগ্রপাদ-
মাক্ষিপ্য কাচিদ্‌দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরাগবাক্ষা-
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান॥৭।৫৮

[প্রসাধিকা দ্বারা একটি চরণ মাত্র যখন অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছে তখন উহা বেগে টানিয়া নিয়া আপনার অভ্যস্ত মৃদু-মন্দগতি পরিত্যাগ করিয়া কোন সুন্দরী বাতায়ন পর্যন্ত অলক্তচিহ্ন রঞ্জিত করিয়া দ্রুত বেগে পদপাত করিয়া গেল।]

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী॥৭।৫৯

[অপর কোন সুন্দরী দক্ষিণ নয়নে কাজল আঁকিয়া ও বামনেত্রে কাজল না আঁকিয়াই অঞ্জনশলাকা হস্তে বাতায়ন সমীপে গমন করিলেন।]

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ
হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥৭।৬০

[আর এক নারী বাতায়ন-পথে চাহিতে চাহিতে দ্রুতবেগে চলিতে গেলে কটিগ্রন্থি শিথিল হইলেও পুনরায় বন্ধনের অবকাশ পাইলেন না। কটিবসন হস্ত দ্বারা সংযমিত করিবার সময়ে করাভরণের দীপ্তি তাঁহার নাভিগহ্বর পূর্ণ করিল।]

অর্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ
পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানী-
মঙ্গুষ্ঠ-মূলার্পিতসূত্রশেষা ॥৭।৬১

[সত্বর উঠিতে গেলে কোন সুন্দরীর অর্ধগুম্ফিত রশনার মুক্তারাজি সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইবার ফলে প্রতি পদক্ষেপে স্খলিত হইলেও শেষ পর্যন্ত অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্রখানি মাত্র রহিল।]

চিরায়মানা কবিতাটি এই—

যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।
বেণী না-হয় এলিয়ে রবে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাই বা হল পত্রলেখায় সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ।
যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ ॥

এসো দ্রুত চরণ দুটি তৃণের পরে' ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক্,
নূপুর যদি খুলে পড়ে না-হয় রেখে এলে!
খেদ কোরো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে।
এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের পরে' ফেলে॥

হেরো গো ওই আঁধার হল আকাশ ঢাকে মেঘে।
ওপার হতে দলে দলে বকের শ্রেণী উড়ে চলে,
থেকে থেকে শূন্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে।
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠমুখে ধেনুরা ধায় বেগে।
হেরো গো ওই আঁধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে॥

প্রদীপখানি নিবে যাবে, মিথ্যা কেন জ্বাল।
কে দেখতে পায় চোখের কাছে কাজল আছে কি না আছে,
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।
আঁখির পাতা যেমন আছে এমনি থাকা ভালো,
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জ্বাল॥

এসো হেসে সজলবেশে, আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গো বালা
ভূষণ যদি না হয় সারা ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব গগন, বেলা নাইরে আজ।
এসো হেসে সজল বেশে, নাই বা হল সাজ॥

বলা বাহুল্য কালিদাসের কাহিনীর পটভূমি হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার পটভূমি স্বভাবতঃ পৃথক। তৃতীয় স্তবকে কবি সেই পটভূমি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম স্তবকে যেমন অসংযমিত

কেশপাশের সৌন্দর্যের কল্পনা ‘বেণী না-হয় এলিয়ে রবে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে’, কালিদাসের প্রথম স্তবকেও দেখি,—

“বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ
করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ।”

দ্বিতীয় স্তবকে তৃণদলে সুন্দরীর চরণ-বিন্যাসের ফলে অলক্তরাগ মুছিয়া যাইবার আশঙ্কা,—

“এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের পরে’ ফেলে।
ভয় কোরো না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক,”

কালিদাসের দ্বিতীয় স্তবকেও দ্রুত চরণ-বিক্ষেপের ফলে গবাক্ষ পর্যন্ত অলক্তক-চিহ্ন অঙ্কন।

“উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরাগবাক্ষা-
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান”।

চতুর্থ স্তবকে অঞ্জন-বিরহিত নয়নের সৌন্দর্যের বর্ণনা, কালিদাসের পরবর্তী শ্লোকেও বর্ণনীয় বিষয় তাহাই।

দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্তবকে যথাক্রমে কবি বলিয়াছেন, ‘খেদ কোরো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে’ এবং ‘গাঁথা যদি না হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গে বালা,’ কালিদাসের পঞ্চম শ্লোকে সুন্দরীর আধগাঁথা মালার মুক্তাগুলি খুলিয়া পড়িয়াছে।

বিস্রস্ত-বসনা সুন্দরীর উল্লেখ কালিদাসের চতুর্থ শ্লোকে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম স্তবকে।

চিত্রগুলির ক্রমবিন্যাসেও যে সাদৃশ্য বর্তমান তাহা বোধ হয় এতক্ষণে বিশদ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গান এখানে উদ্ধৃত হইতেছে, ইহার বিষয়বস্তুও পূর্বোক্ত কবিতার অনুগামী।

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজল বিহীন সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো॥
আকুল আঁচলে পথিক চরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো॥
এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই ;
যে আসে আসুক ওই তব রূপ অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো॥
শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানিয়ো উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো॥

অস্থানোচিত সজ্জার একটি চমৎকার উদাহরণ কালিদাসে আছে, সেই উদাহরণটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিব। উদাহরণটিতে কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নাই ; কবির বাস্তববোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি এখানে এত প্রবল যে বৈষ্ণবসাহিত্যের কোন উদাহরণই তাহার সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না।[১] বিবাহোচিত বেশে জননী মেনা গৌরীকে সাজাইতেছেন,—

ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ
স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্যমাণ-
মূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্।—৭।২৫

[চোখের জলে আকুলিতদৃষ্টি মেনা ঊর্ণাময় (মেষাদির রোমে

১। নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে অস্থানোচিত প্রসাধনের উল্লেখ আছে,—

"যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহকচ্ছেদ-বিভক্ত-রাগ-
মকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥"
—কুমার ১।৪ [শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ 'ভূমিকা'য় আছে।]

নিমিত্ত) মঙ্গলসূত্র যেস্থানে বাঁধিতে হইবে সেখানে না বাঁধিয়া দৃষ্টির আকুলতা বশে অন্যত্র যেমন পরাইতে যাওয়া অমনি উমার ধাত্রী নিজের অঙ্গুলী দিয়া তাহার যথাযোগ্য স্থানে তাঁহার হাত সরাইয়া দিলে তিনি উমার হস্তে উহা বাঁধিয়া দিলেন।]

নেত্র-শোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি বিরুদ্ধধর্মের আরোপ দ্বারা চমৎকৃতি সৃষ্টির উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে বিরল নয়। দৃষ্টিপথে যেমন যাহা কিছু অভিরাম তাহা আমাদের চিত্তে আপন সঞ্চয় রাখিয়া যায় শ্রুতিপথেও তেমনি ধ্বনিচিত্র আমাদের কল্পনাকে অধিকার করে, বলাবাহুল্য স্পর্শনাদি দ্বারাও ঠিক এই ব্যাপার ঘটে। চিত্তের আহ্লাদন ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দিষ্ট বলিয়া দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাদির স্বরূপে এই ব্যাপারে মূলতঃ ভেদ নাই। উক্ত আহ্লাদন ব্যাপারে দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শাদির স্থূল অভিজ্ঞতা আমাদের চিত্তে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহার সহিত মিলিয়া এই সকল অভিজ্ঞতার স্মৃতি চিত্র-রূপে আমাদের বাসনা-লোক অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের উক্ত অনুভূতি ও তাহার চিত্ররূপগুলি আমাদের বাসনালোকে পরস্পরের পরিপোষক। ইহাদের প্রত্যেকটি কখনও পৃথকভাবে, কখনও একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া নূতন বিশেষ বিশেষ চিত্র ও অনুভূতির সৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার জগতের স্থূল অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত অনুভূতি এবং মানসচিত্র হইতে কাব্যে প্রকাশের উপযোগী ভাবের যেমন সৃষ্টি, তেমনি বিপরীত পক্ষে কাব্যে প্রকাশিত ভাব হইতে আবার নূতন অনুভূতি ও চিত্র ভাবুক পাঠকের চিত্তে আশ্রয় লাভ করে। এই চিত্র নিরলঙ্কার ভাষা দ্বারা অথবা অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে। ভাব ও চিত্রের পার-স্পারিক অন্বয়ের ক্ষেত্রে অলঙ্কারের কাজ দ্বিবিধ ;—সে কখনও ভাবকে

চিত্ররূপে প্রকাশ করে, কখনও চিত্রকে ভাবের রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার উদাহরণ বিচার করিয়াছি।

ইন্দ্রিয়গণের প্রতি বিরুদ্ধ গুণধর্মের প্রয়োগের উদাহরণ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ হইতে সংকলন করিলে দেখিতে পাইব যে উভয় কবিই চমৎকৃতি সৃষ্টির ব্যাপারে ভাষার এই তির্যক্‌রীতির প্রতি অভিনিবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"কড়ি ও কোমলের" 'চুম্বন' কবিতায় কবি লিখিতেছেন,—

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে,—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।"

'কথা ও কাহিনীর' 'পরিশোধ' কবিতায়—

"এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হ'তে।"

'মানসী'র 'নারীর উক্তি'তে—

"মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।"

এখানে প্রথম উদাহরণে অধরে শ্রুতিগুণ, দ্বিতীয়ে চক্ষুতে স্পর্শনগুণ ও তৃতীয়ে পুনরায় নয়নে শ্রবণশক্তি আরোপিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীর উদাহরণের অন্ত নাই। আমরা মাত্র দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

মহারাজ দিলীপ পুত্রমুখ দর্শন করিতেছেন,—

নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুষা
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু-দর্শনাদ্
গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি। —রঘু ৩।১৭

[নিবাত-নিষ্কম্প-পদ্মনয়নে অনিমেষে রাজা পুত্রমুখসুধা পান করিতে করিতে চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের ন্যায় আনন্দে আর আত্মস্থ রহিলেন না।]

রঘুবংশেরই দ্বিতীয় সর্গে ১৯ শ্লোকে—

বশিষ্ঠধেনোরনুযায়িনংত-
মাবর্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্মপংক্তি-
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্॥

[স্ত্রী সুদক্ষিণা দিলীপকে বশিষ্ঠের ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া নয়নে নিমেষপাত পর্যন্ত বর্জন করিয়া তৃষাতুরার ন্যায় আগ্রহে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।]

নিম্নোক্ত শ্লোকটি অধিকতর বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ—

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো
নার্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথা হি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥ —রঘু ৭।১২

[সেই নারীগণ দৃষ্টিদ্বারা বরবেশী রাঘব অজকে তৃষার্ত নয়ন দ্বারা যখন পান করিতেছিল তখন অজকে ছাড়িয়া আর কোন দিকে

তাহাদের দৃষ্টি গেল না। যেন তাহাদের অপরাপর সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দৃষ্টিকে আসিয়া আশ্রয় করিল।]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিনিচয়ে এই ভাবটি প্রকাশমান ;—

"আহা, আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দুহাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।"

বিদেহ সৌন্দর্য ও মানসসুন্দরীর কল্পনা

নারীমূর্তির আশ্রয়ে অমূর্ত সৌন্দর্যের কল্পনা রবীন্দ্রকাব্য-রসিকের সুপরিচিত। 'সোনারতরী'-'চিত্রা' হইতে 'পূরবী'-'মহুয়া' পর্যন্ত 'অপরিচিতা', 'সুন্দরী', 'বিদেশিনী', 'মানসসুন্দরী', 'কৌতুকময়ী', 'জীবনদেবতা', 'লীলাসঙ্গিনী' প্রভৃতি বিবিধ নামে কবি যাহাকে আখ্যাত করিয়াছেন, কবির জীবনে সৃষ্টির প্রেরণারূপে বার বার যে দেখা দিয়াছে সে কবির রহস্যময় সৌন্দর্য-চেতনা ব্যতীত আর কিছু নয়। জীবনের বহু বিচিত্র পরিবেশে নব নব রূপে সে কবির চিত্তকে নব নব চরিতার্থতার পথে নিয়া গিয়াছে। কবির কাব্যে যখন সে বিষয়রূপে গৃহীত হয় নাই তখনও প্রসাধিকা রূপে অপর উপজীব্য বিষয়কে সে রস-নিবিড় করিয়াছে। বিদেহ-সৌন্দর্যের এই মানসী-কল্পনায় কবির মৌলিকতার দাবী অবিসংবাদিত। বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের নিকট হইতে এ বিষয়ে তিনি কতটুকু প্রেরণা পাইয়াছেন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং সে চেষ্টা আমাদের বর্তমান রচনার উদ্দেশ্যের

বহির্ভূত। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যরীতির সহিত ইহার একটি নিগূঢ় সম্পর্কে আছে বলিয়া মনে হয়:

ঋতুসংহার ও মেঘদূতে কালিদাস প্রেমকে প্রকৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত পরিণত শক্তির পরিচায়ক 'মেঘদূত' কাব্যে কবি প্রেম ও প্রকৃতির টানা-পড়েনে কাব্যসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

—উত্তরমেঘ, ৪৩

এখানে যক্ষপ্রিয়া ও প্রকৃতিকে মিলাইয়া অখণ্ড করিয়া দেখিবার চেষ্টা আছে। এ কেবল সৌন্দর্য-লক্ষণের তালিকা নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়-ও 'মানসসুন্দরী'র 'কবিতা কল্পনালতা'কে ঠিক এই ভাবেই দেখিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। সেখানেও—

"চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে—"

সেখানেও-

"ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘভারে।"

কবি-মানসীর বসন্তে আবির্ভাব এই যেমন বর্ণিত হইয়াছে তেমনি তাহার বর্ষার বর্ণনা—

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে,
বনপথে আঁসি করিতে উদাসি কেতকীর রেণু মেখে,
বর্ষাশেষের গগনকোনায়-কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন খনে কখন অন্যমনায় ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে গিয়েছিলে ডেকে ডেকে ॥

অন্যত্র—

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে নীরবে লভিব তারে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে ?

প্রকৃতি ও নারী—এই উভয়ের সত্তা তাঁহার কল্পনায় অনেক স্থলেই যে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে এই উদাহরণে ইহাই প্রকাশমান।

কবির দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য নারীর প্রেমের সম্পর্কে আসিয়া মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নের উদাহরণটিতে পুষ্প এই প্রেমের স্মারক, তাই সুন্দর।

'বেল জুঁই শেফালিরে জানি আমি ফিরে ফিরে—
কত ফাল্গুনের কত শ্রাবণের আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা ॥

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি যে কাো-আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণ-ঝঙ্কারসুরে মাখা—
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা॥'

—নীলমণিলতা॥

বিবিধ ঋতুপর্যায়ে প্রকৃতির লীলা ও নর-নারীর মিলন-বিরহলীলা ঋতুসংহার-মেঘদূত-স্রষ্টার কবি-মানসেও এক বৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর একটি কথাও এপ্রসঙ্গে বলিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের—

"কখনো আমের নব মুকুলের বেশে
কভু নব মেঘভারে"

পংক্তিটিতে মেঘদূতের 'শ্যামাস্বঙ্গং' ইত্যাদি শ্লোকটির (পূর্বে উদ্ধৃত) পংক্তিরাজির মতই ছন্দের দীর্ঘ প্রবহমাণতা লক্ষ্য করিবার।

'পুরবী'র 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতে অতীতের স্মৃতি ও অনুভূতির পুনরুদ্বোধনের জন্য যে আকুলতা তাহা যে কবির এক পূর্ব-কথিত বৈশিষ্ট্য ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যখানিতে দেখি কবি আদ্যন্ত কবি-প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া ষড়ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহাকে শ্রোত্রী কল্পনা করিয়া কাব্যখানি রচিত তিনি কাব্যের অন্তর্গত নন; কাব্যে তাঁহার সম্পর্কে কোন কথাই নাই। কিন্তু তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যের আখ্যাপনে কবির দ্বিবিধ আনুকূল্য সাধিত হইয়াছে,—কবির কল্পনার রমণীয়তা ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আদিরসের ইহাতে পরিপোষকতাও সাধিত হইয়াছে।

শৃঙ্গাররসাত্মক পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের যেগুলিতে এক একটি শ্লোকে এক একটি ভাব বা চিত্র রচিত হইয়াছে, যেমন শৃঙ্গার শতক, চোর-(সুরত)-পঞ্চাশিকা, অমরুশতক ইত্যাদি গ্রন্থে, সেখানে দেখি একটি নারী নায়িকারূপে কল্পিত হইয়াছে এবং মিলন-বিরহের বিবিধ অবস্থা তাহাকে অবলম্বন করিয়া কবি কল্পনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বর্ণনার যত প্রকার অভিনবত্বই কবিগণ প্রকাশ করিয়া থাকুন কবির ব্যক্তিচিত্তের অনুভূতির প্রকাশ উহাতে বিরল।

রবীন্দ্রকাব্যে এই কল্পিতা নারী কবির জীবনের সহিত বিচিত্র সম্পর্কে অন্বিতা হইয়া উঠিয়াছেন। কালিদাসের উক্ত কাব্যের পক্ষে যিনি ছিলেন অবান্তর চরিত্র পরবর্তী উক্ত শৃঙ্গার-কাব্যগুলিতে তাঁহার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং রবীন্দ্রকাব্যে তিনি কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছেন।

এই ধরণের অঙ্গীকরণের উদাহরণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও আছে। এক সময়ে হাস্যরসের পরিবেষণের নিমিত্ত নাটকে এমন চরিত্রের সংস্থান ছিল নাট্যব্যাপারের দিক হইতে যে সম্পূর্ণই অবান্তর। বর্তমানে নাটকের ঘটনা সংস্থানের দিক হইতে অপরিহার্য চরিত্রের উপরই হাস্যরস-পরিবেষণের ভার নির্দিষ্ট হয়, কারণ একথা আজ সুবিদিত যে যে-সকল মুখ্য চরিত্র জীবনের গভীরতর অনুভূতি-গুলিকে রঙ্গমঞ্চে অভিব্যক্ত করিতে নিয়োজিত হয় তাহাদের জীবনেও হাসির স্থান আছে, শুধু হাসির সৃষ্টির জন্যই পৃথক কোন চরিত্রের উপস্থাপনাই হাস্যকর। অতএব নাটক-সৃষ্টির প্রথম যুগে যে চরিত্র নাট্য-ব্যাপারের পক্ষে অবান্তর হইলেও শুধু হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাটকে স্থান পাইয়া আসিয়াছে এমন সকল চরিত্রকে পরবর্তী-কালে নাটকের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ

নাট্য-ব্যাপারে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ ও হাস্যরসের সৃষ্টি, এই উভয়বিধ দায়িত্ব এই চরিত্রকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

তপোবনের আদর্শ ঃ—

জ্ঞান-সাধনার তীর্থক্ষেত্র প্রাচীন ভারতের তপোবন রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে এবং কবির কাব্যে ও জীবনে আপন প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছে। যৌবনে যে-তপোবনে প্রবেশ করিতে—

"রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি।"

এবং পরিশেষে বার্ধক্যে—

"প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

—তপোবন, চৈতালি।

বিংশ শতকের কবিকে সেই তপোবনের আদর্শ মুগ্ধ করিয়াছে। এই তপোবনের চিত্র কালিদাসের রঘুবংশ-শকুন্তলার চিত্র।[১] কালিদাসের যুগে-ও তপোবনের যুগ অতীতের কথাই ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ যখন গৃহের বৌদ্ধগণ ও বাহিরের শক-হূণদের দ্বারা পীড়িত তখনও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শকে অবলম্বন

১। "আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।"
(আত্মপরিচয়, ৬ সংখ্যক প্রবন্ধ)

করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। শক্তি ও ঐশ্বর্যের লীলাভূমি রাজধানী অদূরবর্তী জ্ঞান, শান্তি ও ত্যাগের নিকেতন ঋষির তপোবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়েই প্রাচীন ভারতের স্বরূপ প্রকাশমান। দৃপ্ত রজোগুণের মত সপ্রকাশ যে রাজধানী—

"ব্রহ্মাণের তপোবন অদূরে তাহার
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।"

—প্রাচীন ভারত, চৈতালি।

কালিদাসীয় কাব্যে অতীত আদর্শের এই অনুসরণ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং একদিকে ভাবপ্রবণ কবিচিত্তে কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছে ও অপরদিকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে অতীত ভারতের তপোবনের অনুসরণে শিক্ষায়তন স্থাপনে কবিকে উৎসাহিত করিয়াছে। কালিদাস তাঁহার যুগের ঐশ্বর্য-সম্ভোগ হইতে প্রাচীন ভারতের দিকে ফিরিয়াছিলেন,[১] রবীন্দ্রনাথ একালের জড়বাদী সভ্যতার সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে বলিয়াছেন,—

'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীনযুগের প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকের পরিবেশ প্রাচীন-ভারতীয়। তা বলিয়া গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ নাট্যকারগণের ন্যায় পৌরাণিক নাটক রচনায় কিন্তু কবি যত্নশীল নন, আধুনিক যুগের সমস্যার বা সর্বকালের সৌন্দর্য-

---

১। • Creative unity (রবীন্দ্রনাথ) ৫৩ পৃঃ দ্রঃ।

নুভূতির প্রকাশ তাহাদের উপজীব্য। পৌরাণিক নাটকের সুলভ ভক্তিরস সেখানে ফলশ্রুতি নয়। চরিত্রগুলিও কাল্পনিক,—পৌরাণিক চরিত্র নয়। অথচ প্রাচীন যুগের স্মারক রাজা, রাণী, মন্ত্রী, রাজ-বয়স্য, সেনাপতি, সভাকবি ইত্যাদি চরিত্র সেখানে বর্তমান।

শুধু নাটকে নয়, তাঁহার কাব্যে প্রেমিক আসে রাজবেশে ; মৃত্যুর এবং অভীষ্ট-দেবতার আবির্ভাব, মহান আদর্শের প্রকাশ রাজবেশে। রথ সেখানে যান, মুকুট শিরোভূষণ। সব মিলিয়া আমরা প্রাচীন কাব্যের পরিবেশ সর্বত্র অনুভব করি। প্রাচীন কাব্যের পরিবেশ বলিতে আমরা রঘুবংশ-শকুন্তলাদির কথা বলিতেছি, রামায়ণ-মহাভারতের নয়। সে-কালের এই আঙ্গিক গ্রহণে বোঝা যাইতেছে কবির চিত্ত কোন্ রসে রসিয়া আছে।

কালিদাসের কাব্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া রচিত কবিতা

প্রথম অধ্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ আমরা যে সকল কবিতার উল্লেখ করিয়াছি ভাবের ও প্রকাশ ভঙ্গীর দিক হইতে তাহারা এক প্রকারের নয়। 'সেকাল' কবিতায় কবির চিত্ত কৌতুক-সরস, ছন্দ সেখানে লঘুচালের, উৎসর্গের ২৬ সংখ্যক কবিতায় কবিচিত্ত ভাবগম্ভীর, ছন্দ-ও মহাপয়ার। কিন্তু এক বিষয়ে কবিতাগুলিতে একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য প্রকাশমান।

কালিদাসীয় কাব্যের সৌন্দর্যে কবির অন্তর ভরিয়া আছে। 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি নিজে কালিদাসের কালের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে কবির স্বদেশোৎকতা

(nostalgia) এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশমান। অন্তরের গভীর অকৃত্রিম আবেগ, কালিদাসের শ্লোকরাজির ভাব, চিত্র ও শব্দ-সম্ভারের ঐশ্বর্য সব মিলিয়া কালিদাসীয় কাব্যের আবহাওয়ার এক রসঘন প্রকাশ এখানে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাই কবিতাগুলির একমাত্র সম্পদ নয়, কালিদাসের কাব্যের যে সারীভূত-নির্যাস এখানে পাওয়া যায় তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ ইহার কোন কোন কবিতায় মিলিত হইয়াছে—যেমন মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায়, কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায়। ইহাই প্রতিভার দান। 'স্বপ্ন' ও 'মেঘদূত' উভয় কবিতায়ই আত্মতন্ত্রিতা প্রবল, স্বদেশোৎকতাও (nostalgia) প্রবল। কালিদাসের মেঘদূত বিরহের কাব্য; কিন্তু আলোচ্য কবিতায় বিরহের বিষাদ গাঢ় হইয়াছে যে ভাবটির প্রকাশে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা প্রকাশমান,—

"ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ।
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।"

'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতা দুইটি কুমার-সম্ভবের মদনভস্ম ও মদনের পুনরুজ্জীবনের ক্ষীণ তথ্য অবলম্বনে সম্পূর্ণ নবীন কাব্যের সৃষ্টি—মদনের স্থূল কায়িক আবির্ভাবের যুগ যখন আর নাই। বঙ্কিম পথে প্রণয়দেবতার রহস্যময় আবির্ভাব হৃদয়রাজ্যে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে তাহা ব্যাখ্যা ও বোধের অতীত। তাই তিন-স্তবকের কবিতা 'মদনভস্মের পর'-এর শেষের দুই স্তবকে নিশ্চয়াত্মক বোধের কোন বাক্য নাই।

"আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
উর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা॥

দেহীর র্যোম্যান্টিক-কবি-সুলভ কল্পনায় বিদেহিতা-প্রাপ্তির বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে যে আলোচনা আমরা করিয়াছি সেই পথে পরবর্তী স্তবকটি কাব্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণ শয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরানমন উল্লসি
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে—
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে॥

চিত্র-কল্পনায় কালিদাসের প্রভাব

চিত্র-রচনায় কালিদাসের কোন উপমা বা অনুরূপ চিত্রের প্রভাব কেমন করিয়া রবীন্দ্রকাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গক্রমে সে বিষয়ে কিছু উদাহরণ সংকলন আমরা

পূর্বেই করিয়াছি। এইবার এবিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর অর্থগত সাদৃশ্য-যুক্ত কয়েকটি উদাহরণ নির্দেশ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

(ক) 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার মানস-ভ্রমণ অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,—

"গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুম-কপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনি ;"

এই প্রসঙ্গে 'মেঘদূত' কাব্যের "কর্ণেলোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ" (উত্তরমেঘ, ৪২) স্মরণীয়।

(খ) 'মানসী'র 'মানসিক অভিসার' কবিতাটিতে 'মেঘদূত' কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। কবিতাটির তৃতীয়স্তবকে একখানি ছবি—

"হয় তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদু পদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানস-মুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।"

ইহার সহিত "মামাকাশ-প্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহোতোর্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।" (উত্তরমেঘ, ৪৫) তুলনীয়। [স্বপ্নে তোমাকে পাইয়া যে আমি নির্দয় আলিঙ্গনের নিমিত্ত আকাশে বাহু বিস্তার করিয়া থাকি সেই আমাকে ইত্যাদি]

ইহার পরবর্তী শ্লোকের ভাব-সাদৃশ্যও প্রভাবাত্মক। উদ্দিষ্ট স্তবক দুইটি এই ঃ—

তারি ভালবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস।

মেঘদূত কাব্যে দেহ-স্পর্শের কল্পনা—

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

—উত্তরমেঘ, ৪৬

[দেবদারুর নবোদ্গত পত্রপুট ভিন্ন করিয়া তাহার নির্গলিত ক্ষীরের গন্ধে সুরভিত হইয়া দক্ষিণ দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তোমার অঙ্গের স্পর্শ তাহাতে থাকিতে পারে মনে করিয়া হে গুণবতি, আমি সেই হিমালয়-পবনকে আলিঙ্গন করি।]

এখানে ভাবের দিক হইতে উভয় কবির রচনায় পার্থক্য শুধু এই যে কালিদাসে বায়ু দৈহিক স্পর্শের বাহন; রবীন্দ্রনাথে মানস নৈকট্য-বোধের ব্যঞ্জনা; কিন্তু 'বাহু-সুকোমল'-এ দেহের ইঙ্গিত আছে। কালিদাসের কাব্যানুভূতি ও কবি-কল্পনায় বস্তুতন্ত্রিতা প্রবল, রবীন্দ্রনাথে ইহারা মুখ্যতঃ ভাবদ্যোতক।

“কালিদাসের প্রতি” কবিতার

“কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্য ভরে
পরায়ে দিতেন উমা তব চূড়া’ পরে”

এই অংশের সহিত

“জ্যোতির্লেখাবলয়িগলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দল-প্রাপি কর্ণে করোতি।” —পূর্বমেঘ, ৪৪

[চন্দ্রক-খচিত যাহার পুচ্ছ পুত্রস্নেহবশতঃ পদ্মদলের অবতংস পরিত্যাগ করিয়া ভবানী স্বীয় কর্ণে ধারণ করেন।] মিলাইয়া না পড়িলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে না।

(ঘ) ‘কথা’ কাব্যের ‘পরিশোধ’ কবিতায়—

“রুদ্ধ হল চারিধার ;
নিস্তব্ধ নিষেধ সম প্রসারিল কর
লতা-শৃঙ্খলিত বন।”

এই অংশের সহিত

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি-সংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥”—কুমার ৩।৪১

এই শ্লোকের চিত্র-কল্পনার সাদৃশ্য অতি প্রকট।

(ঙ) “নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ-ছায়ায় সম্বৃত অম্বর” ইত্যাদিতে

যাহার আরম্ভ সেই গানটির দ্বিতীয় স্তবকে মেঘোদয়ে আশ্বস্ত পৃথিবীর চিত্রখানি এই ঃ—

দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।

এই চিত্র-কল্পনায় কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকটির প্রেরণা অতি স্বাভাবিক,—

"আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য
পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘকালোল্বন-তাপয়েব
মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা॥" —কুমার ৭।৮৪

[অপাঙ্গ পর্যন্ত কর্ণদ্বয় বিস্তার করিয়া ভবানী পুরোহিতের সেই বাক্যসুধা পান করিলেন যেমন করিয়া গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ধরণী ইন্দ্রলোকের বারি প্রথম পান করে।]

(চ) 'পরিশেষ' কাব্যের 'প্রশ্ন' কবিতার প্রথম অংশ এই—

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,—
তারা বলে গেল "ক্ষমা কর সবে" বলে গেল "ভালোবাসো"—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো।"
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥"

শেষ পংক্তিতে "ব্যর্থ নমস্কারে" কথাটির উপর রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতী-স্বয়ংবরে ইন্দুমতী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত রাজগণের

প্রতি বাক্যহীন প্রত্যাখ্যানসূচক নমস্কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়[১]

১। [তুলনীয় "ঋজু-প্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী
প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥"—রঘু ৬।২৫

ইন্দুমতীর এই ভাবশূন্য মৌন-প্রণাম রবীন্দ্রনাথের যে ভালো লাগিয়াছিল ছিন্নপত্রের একস্থানে তাহার প্রমাণ আছে।

"……সুনন্দা এক এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য-রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তাহলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।"

—সাজাদপুর, ২৯শে জুন, ১৮৯২—এর পত্র।

পরিশিষ্ট

কালিদাস ও অপরাপর লৌকিক সংস্কৃতের কবিগণের প্রভাব—তুলনামূলক বিচার

কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক বিচারে উভয় কবির ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর যে সকল বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে কালিদাস ব্যতীত অপরাপর লৌকিক সংস্কৃতের কবিগণের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক ঠিক তেমনভাবে বিচার করা চলে। এই বিচার হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক সংস্কৃতের কবিবর্গের মধ্যে কালিদাসের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাসের রচনা ব্যতীত অন্যান্য কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। গীতগোবিন্দ, কাদম্বরী, অমরুশতক ও চৌর-(সুরত)-পঞ্চাশিকা যে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাদম্বরী গুরুগম্ভীর ভাষায় লেখা গদ্যকাব্য, অপরগুলি শৃঙ্গাররসাশ্রিত লঘু-পাঠ্য কাব্য। এই পরবর্তী শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয় শুধু এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভর্তৃহরি, হাল ইত্যাদির কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কি না তাহার নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই কিন্তু উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যবর্তিতায় এবং রসিকজনের সহিত আলোচনায় ও ইতস্ততঃ উদ্ধৃতিতে শৃঙ্গাররসাত্মক

সংস্কৃত শ্লোকের সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ হেবার্লিনের একখণ্ড 'কাব্যসংগ্রহ' কৈশোরেই তাঁহার হস্তগত হয়।

বাংলা অক্ষরে ছাপা ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত একখানি গীতগোবিন্দ প্রথম যখন তাঁহার হাতে পড়ে "আমি তখন সংস্কৃত জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম।......জয়দেব সম্পুর্ণ তো বুঝি নাই, অসম্পুর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীত-গোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম"।[১]

আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে লাইব্রেরীতে নানা গ্রন্থ ছিল। "লাইব্রেরীতে আর একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবার্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ।—কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।"

'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ কবির বাণভট্টের সঙ্গে পরিচয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্রেও দেখি "কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্ছে। শ দুয়েক পাতা হয়েছে—"

—৮ই শ্রাবণ, ১৩০০

এই সকল গ্রন্থপাঠের ফলও ঠিক কালিদাসীয় রচনার মতোই

১। জীবনস্মৃতি ১৩৪৪ সং ৭৭—৭৮ পৃঃ।

২। ঐ পৃঃ ১৬১—১৬২

ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যদিও সে প্রভাব গৌণ, সাময়িক ও স্বল্পপ্রসার এবং কালিদাসীয় প্রভাবের ন্যায় গভীর ও বহুবিস্তার নয়। প্রভাব-নির্ণয়ের প্রয়োজনে এই কবিদিগের স্থান আমরা তিন পৃথক শ্রেণীতে নির্দেশ করিতে পারি। এক শ্রেণীতে জয়দেব, এক শ্রেণীতে অমরু ও অন্যান্য শৃঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকরাজির রচয়িতৃগণ এবং এক শ্রেণীতে বাণভট্ট।

জয়দেব

জয়দেবের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বাল্যকালেই ঘটিয়াছিল ও জয়দেবের ছন্দের দোলা তখনই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।[১] কিন্তু জয়দেবের ছন্দের ঐশ্বর্য সম্পর্কে তিনি সচেতন হইলেও তাঁহার ভাবের দারিদ্র্য সম্পর্কেও তিনি সমান অবহিত ছিলেন। [তুলনীয়ঃ— "জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়,—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়"। ইত্যাদি]

তথাপি বাল্যে জয়দেবের ছন্দের দোলাকে এই যে ভালো-লাগা তাহা পরিণত বয়সের রচনার মধ্যেও আপন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। অবশ্য গভীর-ভাবাত্মক রচনার মধ্যে খুব স্বাভাবিক

১। "যেদিন আমি— অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্—
এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি হইয়াছিলাম।" —জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৬১—১৬২

কারণেই এই চটুল ছন্দের দোলা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, তথাপি 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতাদ্বয়ের ছন্দে 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' 'অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণম্' প্রভৃতির দোলা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রকাব্যে জয়দেবের প্রভাব যেটুকু পরিলক্ষিত হয় তাহা অনুপ্রাস-সম্বলিত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে সংস্কৃত-প্রায় ভাষায় কবিতা রচনার প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রয়াস যে প্রধানতঃ কাব্যিক কসরৎ এবং কবি শক্তিমান বলিয়াই তাহা সুপাঠ্য-মাত্র হইয়াছে,—যেমন অনুকৃত কাব্য তেমন অনুকারী কাব্য, অনুভূতির স্পন্দন কোথাও নাই, নিম্নলিখিত উদাহরণ কয়টি হইতেই তাহা সহজে ধরা পড়িবে।

মনোমন্দিরসুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা! অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী!
রোষারুণরাগ-রঞ্জিতা! বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্গিতা!
গোপন-হাস্য-কুটিল-আস্য কপট-কলহ-গঞ্জিতা!
সংকোচনত-অঙ্গিনী! ভয়ভঙ্গুর-ভঙ্গিনী!
চকিত চপল নব কুরঙ্গ যৌবন-বন-রঙ্গিণী!
অয়ি খল-ছল-গুণ্ঠিতা! মধুকরভয়কুণ্ঠিতা
লুব্ধ-পবন-ক্ষুব্ধ লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!
চুম্বন-ধন-বঞ্চিনী দুরূহ-গর্বমঞ্চিনী।
রুদ্ধকোরক-সঞ্চিত-মধু কঠিন-কনক-কঞ্জিনী॥

চিরকুমার সভার অক্ষয়ের মুখে কবি এই গানটি দিয়াছেন। কবি চিরকুমার সভায় সংস্কৃত কাব্যের আবহাওয়া ঘনাইয়া তুলিয়াছেন

এ কবিতার মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ সংস্কৃত কাব্যের সহিত পূর্ব-পরিচয় ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তথাপি এ কবিতা যেন কেবলই শব্দ-সজ্জার প্রদর্শনী। এই শব্দ-সজ্জায় জয়দেবের কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। নিম্নের কবিতাটির ভাব ও বাগ্‌ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের; ভাষায় যাহা কিছু কৃত্রিমতা তাহা সকলই জয়দেবের অকৃত্রিম উপহার।

অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিলে কবে॥
বঞ্জুল-নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,[১]
চঞ্চল অঞ্চল গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে॥
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জন-কল্লোল[১ক]
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়-হিল্লোল॥
নয়ন-পল্লবে হাসি হিল্লোলে উঠিবে ভাসি,
মিলন মল্লিকামাল্য পরাইবে পরাণ বল্লভে॥

কোথাও বা শুধু একটি অনুপ্রাস গীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যেমন—

(ক) দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে।[২] —সাগরিকা, মহুয়া।

---

১ ও ১ক। জয়দেবের— "মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ-গতং
বিচকর্ষ করেণ দুকূলে" —স্মরণীয়।

২। তুলনীয়:— শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল জয় জয় দেব হরে।
—গীতগোবিন্দ।

অথবা (খ) সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরু-মর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-ভবনে,
—ভৈরবীগান, মানসী।

ভূমিকায় আমরা বলিয়াছি যে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে, মন যাহাকে সত্য বলিয়া জানে তাহাও কাব্য-বিচারে সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-রচিত পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার নিম্নোক্ত গানটির রচনা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিতে এই গানটি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির প্রথম চরণটি "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্ত-মালদ্রুমৈঃ" পাশাপাশি রহিয়াছে।[১] উল্লিখিত গানটি এই,—

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশত্থপল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে॥
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর বাদল-উছল নির্ঝর-ঝর্ঝর
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে—শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিণী॥
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ারে হানিয়া॥

১। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমিহ তদিদং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

জয়দেবের শ্লোক ও রবীন্দ্রনাথের গানে সাদৃশ্য এই, উভয় কবিই মেঘাবৃত রাত্রির বর্ণনা করিয়াছেন, মেঘনির্ঘোষ উভয় কবির প্রথম পংক্তিতেই বাজিয়া উঠিয়াছে, উভয়ের রচনায়ই সমান গাম্ভীর্যের প্রকাশ রহিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত আর কোন সামঞ্জস্য উভয় রচনায় নাই। যদি উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রমাণ হাতের কাছে না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানের প্রথম পংক্তি পাঠমাত্রেই জয়দেবের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" যাঁহার মনে পড়িবে তাঁহার পক্ষে বিদ্বজ্জনসমাজে আপন অনুভূতির সত্য সপ্রমাণ করা কঠিন।

জয়দেবের অপেক্ষা অমরুর ও অমরুর ন্যায় শৃঙ্গাররসাত্মক এক এক শ্লোকে যাঁহারা এক একখানি চিত্র রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন। এই প্রকার প্রভাবকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি; (ক) কোন বিশেষ শ্লোকের অনুসরণে রচিত কোন বিশেষ কবিতা এবং (খ) শৃঙ্গাররসাত্মক এই কাব্যশাখার সাধারণ অনুপ্রেরণায় রচিত কবিতা। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সমধিক।

(খ) আমরা বারবার বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতকাব্য হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছেন আপন প্রতিভা দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। অমরু, ভর্তৃহরি প্রভৃতির কাব্যে নায়িকারা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবিধ লক্ষণ দ্বারা সুচিহ্নিত। তাহাদের বয়স, নায়কদের সহিত সম্পর্ক ও ব্যবহার, প্রেমের প্রকাশে তাহাদের অবস্থা, সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি ভেদে তাহাদের বৈচিত্র্য প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হইয়া আছে। কেহ স্বকীয়া, কেহ পরকীয়া, কেহ বিপ্রলব্ধা, কেহ কেহ খণ্ডিতা। কালিদাসের কুমারসম্ভবেও আমরা বিবিধ নায়িকা-

লক্ষণে একই উমাকে চিহ্নিত দেখিয়াছি—কখনও তিনি অভিসারিকার লক্ষণে চিহ্নিতা, কখনও তিনি স্বকীয়া মুগ্ধা নায়িকা, কখনও স্বাধীনভর্তৃকা মধ্যা নায়িকা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও এক-এক নায়িকার লক্ষণ-নির্দেশ করিয়া এক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মহুয়া'র অন্তর্গত 'নাম্নী' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ[১] অমরু প্রভৃতির সংস্কৃত কাব্যের উল্লিখিত শ্লোকরাজির আদর্শে রচিত। অথচ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর ; সে পার্থক্য শুধু লক্ষণের নয়, রসের। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণকে অনুসরণ করিয়া রচিত নয়। উহা সত্যকার কাব্য ; কবির অন্তরের স্পর্শ উহাতে লাগিয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতায় এক-একটি চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জিনিস অমরু প্রভৃতির কবিতায় ছিল না। তাঁহাদের নায়িকারা একে অপরের মতো সমান সুন্দরী ও সযৌবনা মাত্র, তাঁহাদের ভেদ শুধু নির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষণে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নায়িকাদের বাহিরের রূপ ও অন্তরের মাধুর্য ধরা পড়িয়াছে এবং সব মিলিয়া তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(ক) রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে পূর্ববর্তী কবিগণের ভাবলোক তাহার মধ্যে কখনও কখনও ধরা পড়ে অথচ নির্দিষ্ট করিয়া কোন বিশেষ কবিতার আক্ষরিক সাদৃশ্য উহার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। কোন বিশেষ শ্লোকের সহিত নিম্নোক্ত কবিতার উক্ত সাদৃশ্য না থাকিলেও সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সাক্ষাৎ ইহার মধ্যে মিলিবে।

যামিনী না-যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে॥

১। রবি-দীপিতা (ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) দ্রঃ।

আলোক পরশে মরমে মরিয়া হেরোগো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে ॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ ঊষার বাতাস লাগি ;
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী', বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি।
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে চলিব কাজে ॥

অমরুশতক-ঋতুসংহারাদি কাব্যের সম্ভোগ-চিহ্নিতা নায়িকার বর্ণনার সহিত ইহার সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। "কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে" পংক্তির 'কামিনী' পদটি শ্লিষ্ট। মেঘদূতের "প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ" (উত্তরমেঘ ৫২) পংক্তিটি এখানে স্মরণে আসে। 'কল্পনা'র 'ঝড়ের দিনে' কবিতা দুর্যোগের প্রহরে যে সাহসিকা অভিসারযাত্রা করিয়াছে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া রচিত। এই কবিতা বা এই গ্রন্থের 'বসন্ত' কবিতার রচনাকালে 'নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কাহিনী'র স্মৃতি কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। এই নায়িকারা সংস্কৃত কাব্যের জগৎ হইতে রবীন্দ্রকাব্যে আবির্ভূত হইয়াছে। কালিদাসের সকল কাব্যেই যেমন অভিসারিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে তেমনি অপরাপর কবির কাব্যেও ইহাদের অবলম্বন করিয়া অজস্র শ্লোক রহিয়াছে।[১] হাল ও

১। কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকাদি স্মরণীয়—

(ক) গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতি-পথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৩৭

গোবর্ধনের কাব্য ইহার খনি। কিন্তু কালিদাসের কাব্যই ইহাদের সকলের পুরোধা। বিশেষতঃ কালিদাসের কাব্যের আবহাওয়া উহাদের কাহারও শ্লোকে নাই, রবীন্দ্রনাথে আছে।

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাটির উপরে অমরুর একটি শ্লোকের প্রভাব আছে মনে হয়।

[সেখানে উজ্জয়িনীতে রাত্রিতে প্রণয়িগণের ভবনে যে অভিসারিকারা চলিয়া থাকে নিকষে স্বর্ণ রেখার মতো রাজপথের সূচিভেদ্য অন্ধকারে বিদ্যুতের বিকাশদ্বারা তাহাদিগকে গন্তব্যপথ দেখাইয়ো ; বর্ষণে গর্জনে বিরত থাকিয়ো ; তাহারা সহজেই সন্ত্রস্তা।]

(খ) গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈ র্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥

—উত্তরমেঘ, ১১

[যেখানে অলকায় দ্রুত ত্রস্ত গতির ফলে অলকদাম হইতে স্খলিত মন্দারপুষ্প, পত্রলেখাচূর্ণ, কর্ণবিলম্বিত স্বর্ণপদ্ম, মুক্তাজাল, পীবরস্তনের আন্দোলনে ছিন্ন-সূত্র হার সূর্যোদয়ে অভিসারিকাগণের রাত্রিকালীন যাত্রাপথকে চিনাইয়া দেয়।]

(গ) নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদোন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ॥ —রঘু ১৬।১২

[যে রাজপথে রাত্রিতে উজ্জ্বল ও কলধ্বনিমুখর নূপুর পরিয়া অভিসারিকারা চলিত এখন সেখানে আমিষলোলুপ উল্কামুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব্দ করিয়া ফিরিতেছে।] এই প্রসঙ্গে রঘু ৬।৭৫ এবং কুমার ৪।১১ শ্লোকটি স্মরণীয়।

সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও।
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু 'যাও'।
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

... ...

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে।
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছে আঁখিনীরে
কেন সে এলনা ফিরে॥

অমরুশতকের শ্লোকটি এই,—

কথমপি সখি ক্রীড়া-কোপাদ্ ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিন হৃদয়স্ত্যক্‌ত্বা শয্যাং বলাদ্‌গত এব সঃ।
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্নি ব্যপেতঘৃণে জনে
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ প্রয়াতি করোমি কিম্॥

—অমরুশতক ১২নং শ্লোক

[সখি, ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে তাহাকে "যাও" বলিয়াছিলাম, কঠিনহৃদয় সে শয্যা হইতে বলপ্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। এই প্রকার সবলে প্রেম ভাঙিয়া যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি চলিয়া গেল পুনরায় তাহারই অভিমুখে আমার নির্লজ্জ চিত্ত যে যাইতেছে কী করিব ?]

সংস্কৃত কাব্যের সৌন্দর্যলোক কবির চোখে যে মায়া-কাজল পরাইয়াছে তাহার ফলে এ-কালের নায়িকাকে তিনি অতীত সৌন্দর্যলোকে স্থাপিত করিয়া নূতন করিয়া দেখেন। এ-যুগের

প্রসাধনে সজ্জিতা এ-যুগের নারীকে দেখিয়া কবির মনে হয় এ যেন প্রাচীন কাব্যের জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়াছে,—

ঠিক এমন করেই দেখা দিত অন্য যুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপ বেশে
ভালবাসার চকিত চোখে

অমরু-শতকের চৌপদীতে—
—শিখরিণীতে হোক স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাতো।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী। —সম্ভাষণ, শ্যামলী।

ভাবসাম্য হেতু নিম্নোক্ত গানগুলি অমরুশতক হইতে নিম্নে উল্লিখিত শ্লোকগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে ঃ—

(ক) হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে॥
রুধিয়া নয়ন দ্বারে বাঁধিয়া রাখিলি যারে
কখন সে এল ছুটে নয়ন মাঝে॥ —প্রায়শ্চিত্ত।

অথবা

আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি।
হৃদয় তোমার নয়নের কোণে
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি। —চেনা, উৎসর্গ।

অথবা

জানি তোমার অজানা নাহি গো
কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো,
ধরা পড়ে দুনয়নে ॥
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলি,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে ॥

ইহাদের সহিত অমরুশতকের নিম্নোক্ত শ্লোক মিলাইয়া পড়া যাইতে পারে।

"ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতোঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্‌জনে ॥[১]—২৪ নং

অথবা

ভ্রূভেদো রচিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণহসিতং মৌনেঽভিযোগঃ কৃতঃ।
ধৈর্যে কর্তুমপিস্থিরীকৃতমিদং চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ॥[২]—৯২ নং

[১। রোষে ভ্রূকুটি করিলেও দৃষ্টি তাহাকে অধিক উৎকণ্ঠার সহিত চাহিয়া দেখে, চিত্ত কঠিন করিলেও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, তাহার সহিত

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে অমরুশতকের শ্লোক অনুবাদসহ কবি চিরকুমারসভার রসিককে দিয়া আবৃত্তি করাইয়াছেন।

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নন্থ নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবাক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ॥

[আসে তো আস্থক রাতি, আস্থক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয়া মোর নাহি আসে যদি।
—চিরকুমারসভা, রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ।]

প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত প্রেমের গানের ভাব সংস্কৃত কাব্যের এই শ্লোকমাত্র-দীর্ঘ শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় পাওয়া যায়। ইহাতে অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হয় না যে রবীন্দ্রনাথ ঋণী। যে-সকল ঋণ স্পষ্ট সেখানেও রবীন্দ্রনাথের গান ভাবের কবিত্বময় প্রকাশে ও স্থরের ঐশ্বর্যে মৌলিকতার পূর্ণ সম্মানের যোগ্য।

কথাবন্ধ করিলেও এ-পোড়া মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে, তাহাকে চোখে দেখিলে মান কেমন করিয়া অবলম্বন করা যায় ?

২। দীর্ঘকাল ভ্রূভঙ্গ রচনা অভ্যাস করিয়াছি, চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি, সযত্নে হাসি রোধ করিতে শিখিয়াছি, মৌন অবলম্বনের অভ্যাসও করিয়াছি, ধৈর্য ধারণের জন্য চিত্ত স্থির করিয়াছি, মান রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি ; তবে সিদ্ধি দৈবাধীন।]

বাণভট্ট ঃ—'বিজয়িনী' কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় বাণভট্টের প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বাণভট্টের প্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে এবং কবিতার সাধারণ অলঙ্করণ-পারিপাট্যে (decorative art)। [অলঙ্করণ-পারিপাট্য সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।]

কালিদাসের কাব্যের প্রভাবও সেখানে লক্ষিত হয়। প্রকৃতির সহিত যেখানে কবি মানবহৃদয়কে মিলিত করিয়া উভয়ের টানা-পড়েনে রহস্যজাল বয়ন করিয়াছেন সেখানে কাদম্বরী ও কালিদাসীয় কাব্যের কথা পাঠকের স্মরণ হইবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিচার্য বিষয় নয় অতএব এই প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না।

সংস্কৃতে উদ্ভট শ্লোকাবলি

সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের রসিক চিত্ত যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহার বহু প্রমাণ আছে। তাঁহার 'চিরকুমারসভায়' রসিক কথায় কথায় এই শ্লোকের আবৃত্তি করেন আবার অনুবাদও করেন, তাঁহার 'বাজে কথা' প্রবন্ধে বররুচির নামে প্রচলিত 'ইতর-তাপশতানি যথেচ্ছয়া' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যবহার এবং "সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীল রমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তা মাত্র তখন দূরে ছুঁড়িয়া

ফেলিল।"—এই শ্লোকানুবাদ[১]। এ বিষয়ে আমাদের অনুকূল সাক্ষ্য বহন করে।[২] এই প্রকার বহু শ্লোকেরপূর্ণবা আংশিকউদ্ধৃতি বা অনুবাদ বা উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের রচনায় ছড়াইয়া আছে।[৩]

১। মূল শ্লোকটি এই,—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভপতিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরী-ভ্রমাদ্ দ্রুতমগাদ্ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণিভ্যাং পরিগৃহ্য শুভ্রকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥

২। কবির পরিণত বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নব-রত্নাবলী'তে (১৩১৪ সালে প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কিছু কিছু শ্লোক ছিল। ঠিক কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের তাহার নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই (৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ)। প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নিম্নোক্ত শ্লোকটির অনুবাদ (ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য এবং মূলের আনুগত্যের কারণে) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

মূল শ্লোক :— গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহং।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ॥

অনুবাদ :— গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল,
আমি যে চাতকপাখী চিত্ত বিকল।
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত,
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!

৩। ছিন্নপত্রে উদ্ধৃত

(ক) 'সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে' ইত্যাদি শ্লোকটি ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

(খ) "যদুপতিই বা কোথায়, মথুরাপুরীই বা কোথায়। অতএব হে বন্ধুবর—।

এই সকল শ্লোক শুধু কবির রসজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র নয়, ইহাদের আদর্শেই কবির 'কণিকা' কাব্য রচিত। 'কণিকা' রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। ইহার পদ্যগুলি নীতি-বিষয়ক এবং আকারে ক্ষুদ্র বলিয়াই গ্রন্থের নাম কণিকা; কোনটি দুই পংক্তির, কোনটি চার পংক্তির, কোনটি বা আরো কিছু দীর্ঘ। কোন একটি মাত্র নীতি-বিষয়ক ভাবকে পরিস্ফুট করাই প্রতিটি পদ্যের উদ্দেশ্য। কবির কোন কোন কবিতায় সংস্কৃত কবিতার রচনা-ভঙ্গীর সার্থক সচেষ্ট অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত স্তোত্রের গাঢ়বন্ধতা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটিতে প্রকাশমান। ইহাতে তৎসম শব্দের প্রাবল্য লক্ষণীয়:—

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রি
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ
ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল চলন মন্ত্র॥

ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

অনূদিত অংশটি মূল শ্লোকে এই,—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।

কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ়
ঘন-পিনদ্ধ-কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ—
লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধন-কর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র॥

—মুক্তধারা হইতে।

কালিদাস ও কাব্যে আধুনিকতা

কালিদাস আধুনিক কবিদিগের মধ্যে প্রাচীনতম অথবা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে আধুনিকতম।

কাব্য-বিচারের ক্ষেত্রে আধুনিকতা (modernism) শব্দটি অনেকস্থলে বিভ্রান্তিকর। কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহার কোন কাব্যাংশে এই আধুনিকতা যেমন আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে তেমনি আবার সাম্প্রতিক কালের অনেক কবির রচনায় অনাধুনিকতা প্রকট হইতে পারে। যুগে যুগে মানব-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শের স্বরূপ বদলায়, রুচির পরিবর্তন ঘটে এবং সাহিত্যে তাহার ছবি ফুটিয়া ওঠে; কিন্তু উক্ত ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন যে তাৎকালিকতার স্বাক্ষর সাহিত্যে রাখিয়া যায় তাহাকেই আধুনিকতার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করা ভুল হইবে। সে দৃষ্টিতে কাল যাহা আধুনিক ছিল আজ আর তাহা আধুনিক নয়। যাহা প্রাচীনকালের হইয়াও জীর্ণ নয়, অথবা যাহা বর্তমান যুগের

পটভূমিকায় বেমানান নয়, অথবা যাহা ভাবের দিক হইতে চির-পুরাতন হইয়াও চিরনবীন কাব্য-বিচারে তাহা চিরকালই 'আধুনিক'।[১] ইহার সহিত প্রকাশভঙ্গীর—যাহা সহজেই পুরাতন হইয়া পড়ে,—তাহার আন্তরিকতা থাকিলে তো কথাই নাই।

এই দৃষ্টি নিয়া বিচার করিলে কালিদাসের মেঘদূত কাব্য আধুনিকতার কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষণে প্রাচীনকাব্য সমূহের মধ্যে এক অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা যে নানা যুগ-পরিবর্তনেও বিচিত্র কালের পাঠকসমাজের চিত্ত জয় করিয়া আসিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসরেও পুরাতন হয় নাই তাহার কারণ ইহার এই আধুনিকতা। মেঘদূত কাব্যে ভাবের দিক হইতে যাহা আমাদের চিত্তের প্রবলতম আকর্ষণ তাহা পতিব্রতার পথ-চাওয়ার ছবি নয়, চিরন্তন বিরহের বুকফাটা হাহাকার নয়,—বিরহ এখানে বর্ষভোগ্য মাত্র—পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমের আদর্শ কল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইবার বেদনা। মেঘকে দূতরূপে প্রেরণার ব্যাপারে যক্ষপত্নী লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র।[২] কাব্যে অলকাপুরীর যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা কাব্যের ভূমিকা মাত্র নয়, যক্ষপ্রিয়ার ঠিকানাটা বিশদভাবে জানানোই তাহার উদ্দেশ্য নয়, কাব্যের উহা অপরিহার্য অংশ। যক্ষ তাহার অতীত জীবনের দিকে ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছে, অপরপক্ষে অতীতকালের আদর্শ সৌন্দর্যের কল্পিত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন আধুনিক রোম্যান্টিক সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লক্ষণ।

1. What is most important in modern poetry is not that which distinguishes it from the poetry of yesterday, but that which makes it in its degree one with the poetry of Homer and Sappho, of Shakespeare and Shelley.—Robert Lynd (On poetry and the modern man)

২। দ্রঃ—বাজে কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ। —রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধুনিক কাব্যোচিত এই ভাবটি, সৌন্দর্য ও প্রেমের সঞ্চয়-ভাণ্ড অতীতকালের পৃথিবীর প্রতি উন্মুখ কবি-চিত্তের বেদনাবোধ, নানা স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু কালিদাসের কাব্য হইতেই তাহা যে রবীন্দ্রকাব্যে আসিয়াছে এমন কথা বলা চলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে যে যুগটা Revival of Romanticism নামে চিহ্নিত তাহার মধ্যে এই ভাবটি স্থায়ী স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে এই ভাবটি কালিদাসের কাব্যের আবহাওয়ার মধ্যে বিধৃত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে, ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কথা। মেঘদূত কাব্যে কবি আপন সৃষ্ট সৌন্দর্যরাজ্য হইতে বিরহ কল্পনা করিয়া কবিসুলভ আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' ('মানসী' কাব্যের), 'সে-কাল', 'নববর্ষা' প্রভৃতি কবিতায় কালিদাস-কল্পিত সৌন্দর্যলোক হইতে বিরহ কল্পনা করিয়া অতীতের প্রতি তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন

অতীতের স্বর্ণযুগ আবার ফিরিয়া আসিবে, পৃথিবীর বৃহত্তর ভূখণ্ডের শাস্ত্রাদি এই আশ্বাস দিয়াছে। শুধু শাস্ত্রাদিতে নয়, জীবনে এই "আশাবন্ধঃ", এই আশ্বাস, মানুষকে নিয়ত রক্ষা করে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের শেষেও এই আশ্বাস আছে যে শরৎ-পূর্ণিমা-রাত্রিতে পুনর্মিলনের মধ্যে শাপাবসান ঘটিবে। এই আশ্বাস মহৎ কাব্যের একটি বড়ো লক্ষণ। 'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক উর্বশীর পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। সৌন্দর্যও প্রেমের প্রতি উন্মুখচিত্ত মানবের প্রতি বিংশ শতকের কবির মুখে সুলভ আশ্বাস জোগায় নাই, কবি শুধু করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন,—

"তবু আশা জেগে রয় প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে ॥"

কালিদাসের কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তথাপি একথা উল্লেখ না করিলে বর্তমান নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যে মেঘদূতের পূর্বে অনৈতিহাসিক, অপৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে একখানি কল্পনাশ্রিত সম্পূর্ণ কাব্য আর আমাদের সাহিত্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। সংহত পূর্ণাঙ্গ প্রেমের কবিতা হিসাবে ইহা এ-কালের আখ্যানমূলক অথচ ভাবমুখ্য প্রেমবিষয়ক গীতি-কবিতার সগোত্র ও পুরোধা। আধুনিক কবিতার সহিত এ-কাব্যের সঙ্গতির লক্ষণ এখানেও প্রকাশমান।

সে-কালের কাব্য আধুনিক রোম্যান্টিক কবিতার আত্মতন্ত্রিতায়, ব্যক্তিপুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাণচাঞ্চল্যের লক্ষণে দীন বলিয়া কথিত। ভাবের একটা সাধারণী করণই সেখানে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। —এ সকল কথা আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও মনে হয়, কবির ব্যক্তিত্বের একটা ছায়া মেঘদূত কাব্যে একটি বিচিত্র আবেদনের সৃষ্টি করিয়াছে।[১] এই কাব্যের আধুনিকতার ইহাও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

১। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে দুইটি শব্দের বিস্ময়কর প্রয়োগে ক্লাসিকাল রীতিতে প্রণীত কাব্যে যেন অতর্কিতে আধুনিক কাব্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। কবি লিখিতেছেন—

"শিরীষ-পুষ্পাধিকসৌকুমার্যৌ
বাহু তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।" —১।৪১

কালিদাসের কাব্য সে-যুগের বর্ণনামূলক আখ্যান-প্রধান কাব্যের যুগেও বস্তুবিরল, ভাবনির্ভর, কল্পনা-প্রধান কাব্য। তাঁহার ঋতুসংহার আখ্যানবর্জিত, মেঘদূতে আখ্যানাংশ ক্ষীণ এবং কুমার-সম্ভবে কাহিনী অপেক্ষা কল্পনাবিলাস অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে। শুধু রঘুবংশ ইহার ব্যতিক্রম। অনেকটা এই কারণে, ও প্রাচীন মহাকাব্যের গতানুগতিক ঐতিহ্য ইহাতে সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই প্রাচীন সমালোচক সমাজে ইহার অধিকতর সমাদর লাভ ঘটিয়াছিল। এই কাব্যেও যে-অংশ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সূত্রাকারে কালিদাস রক্ষা করিয়াছেন, এবং যে-অংশ কবি-কল্পনার সৃষ্টি—যেমন দিলীপ ও সুরভির বৃত্তান্ত, নবমসর্গের বসন্ত-বর্ণন, ইন্দুমতীর বিবাহ, অজ-বিলাপ, রাম-সীতার বিমানযাত্রা, কুশের স্বপ্ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ, তাহাই কবি বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক গীতিকবিতাসুলভ কাহিনী-নিরপেক্ষ কল্পনাশ্রয়িতা কালিদাসের এই কাহিনী-মুখ্য মহাকাব্যেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের সহিত এই সকল তথ্যের একত্র সমাবেশের ফলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে কালিদাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সে সাধর্ম্যের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কালিদাস ব্যতীত অপর কোন সংস্কৃত ভাষার কবির কাব্য মধ্যে তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কালিদাস সে-যুগের কবি হইয়াও আধুনিক

[আমার মনে হয় তাহার (পার্বতীর) বাহুযুগল শিরীষকুসুমের অপেক্ষাও সুকোমল।] এই 'মে বিতর্কঃ' শব্দ দুইটিতে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার গোচরী-ভূত কোন সৌন্দর্যপ্রতিমার চিত্র চকিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।]

মনের উপযোগী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যুগোত্তর, প্রাচীন হইয়াও তিনি নবীন।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ--মানস-বৈসাদৃশ্য

সংস্কৃত কাব্য ও বাংলা কাব্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যে কোথায় তাহার বিচার আমরা প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে সংস্কৃত মহাকাব্যের যুগে কাব্যের গঠন স্থাপত্যরীতি সুলভ ছিল, অপরপক্ষে চিত্রধর্মিতা ও বিশেষ করিয়া সঙ্গীতধর্মিতা গীতি-কবিতার স্বভাবসিদ্ধ। একথা যথাক্রমে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্পর্কেও সত্য এবং এইখানে উভয় কবির কাব্য সৃষ্টিতে স্বভাবতঃই যে বৈসাদৃশ্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উভয় কবির মধ্যে কাহার রচনায় স্থিরচিত্রের প্রাধান্য এবং গতিশীলতা কাহার কাব্যে প্রবল, কে পর্বতের বর্ণনায় আনন্দ পান এবং কে নিম্নভূমি ও নদীর বর্ণনায় স্বস্থ বোধ করেন এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ বর্তমান নিবন্ধের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর বোধে এবং সুখপাঠ্য লঘুতর রচনার পক্ষে উপযোগী বলিয়া ইহা আমরা এস্থলে বর্জন করিতেছি। আশা করিতেছি, রসজ্ঞ সুধীজন ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।